মুহম্মদ জাফর ইকবাল
দানব

প্রথম পর্ব

ইউনিভার্সিটির মাঠে দুই ডিপার্টমেন্টের মাঝে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। রাজুর ডিপার্টমেন্ট দল ব্যাট করছে, ক্যাপ্টেন তাদের সাথে পড়ে। টিলে ঢালা একটা বল পেয়ে সে হাত ঘুরিয়ে মারলো, সাথে সাথে ছক্কা। ডিপার্টমেন্টের সব ছাত্রছাত্রী উঠে চিৎকার করে নাচানাচি শুরু করে দিলো, শুধু রাজু তার জায়গা থেকে উঠলো না– হঠাৎ করে তার মুখ ফ্যাকাসে এবং বিবর্ণ হয়ে গেছে। চৈতী দুই হাত তুলে নাচতে নাচতে রাজুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ঢ্যাপসার মতো বসে আছিস কেন? কী হয়েছে তোর?"

রাজু শুকনো মুখে বলল, "না। কিছু হয় নাই।" সে শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে থাকে, এক্ষুনি একটা মারামারি শুরু হবে। কেউ একজন মারা যাবে। সে নিশ্চিত ভাবে জানে, সে বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ পেতে শুরু করেছে।

চৈতী তার পাশে বসে বলল, "কী হয়েছে? এরকম করছিস কেন?"

রাজু প্রায় বলেই ফেলছিলো, মারামারি হবে একটা, তার আগেই বিকট শব্দে একটা বোমা ফাটল খুব কাছাকাছি, সাথে সাথে চিৎকার চেঁচামেচি দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেলো।

রাজুর আশেপাশে দাঁড়িয়ে বসে থাকা সবাই ছুটতে থাকে চিৎকার করে। মাঠের মাঝখানে ক্রিকেট টিম দুটো কেমন যেন ভ্যাবাচেকা মেরে দাঁড়িয়ে আছে। রাজু তখনো বসে আছে তার জায়গায়। সামনে ফাঁকা হয়ে গেছে, সেখানে তার বয়সী একটা ছেলে অত্যন্ত বিচিত্র ভঙ্গীতে বসে আছে, রক্তে তার সারা শরীর ভেসে যাচ্ছে। ছেলেটার চোখে মুখে এক ধরনের বিস্ময়, যেন সে এখনো বুঝতে

পারছে না কী হচ্ছে! রাজ দেখলো ছেলেটা তার মুখে বিস্ময়ের ভঙ্গীটা ধরে রে আস্তে আস্তে বাম দিকে ঢলে পড়ল। তার সামনে আরো দুজন রক্ত মাখা ছেলে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, সার্টের বোতাম বুক পর্যন্ত খোলা, চিৎকার করে কী বল বোঝা যাচ্ছে না।

"রাজু! রাজু!"

রাজু ঘুরে তাকালো, চৈতী চিৎকার করে তাকে ডাকছে। রাজু তখন উঠে দাঁড়ালো, তাকে এখন চলে যেতে হবে এখান থেকে। মাফে যারা ক্রিটেক খেলছিলো তারাও দৌড়তে শুরু করছে। দুরে কোথাও আবার একটা বোমা ফাটার শব্দ হলো- চিৎকার শোনা যাচ্ছে অনেক মানুষের। তৈতি তার হাত ধরে টেনে নিতে নিতে বলল, "তুই ওখানে বসে ছিলি কেন? উঠে আসলি না কেন?"

রাজু কোন উত্তর দিল না। তৈতি আবার বলল, "তুই এরকম কেন?"

"কী রকম?"

চৈতি তার দিকে তাকালো, তার চোখে মুখে মুহূর্তের জন্যে এক ধরনের বিস্ময় খেলা করে, একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "অন্যরকম"

রাজু জানে সে অন্যরকম একেবারে সেই ছোটবেলা থেকে রাজু অন্যরকম। সে তার বাবাকে কখনো দেখে নি, সে যখন খুব ছোট তখন তার বাবা মারা গেছে মাকে দেখেছে কিন্তু মায়ের স্মৃতি খুব বেশি নেই। ফর্সা একজন মহিলার কথা মনে পড়ে, তাকে বুকে চেপে ধরে কাঁদছে এরকম একটা দৃশ্য মাথার মাঝে খেলা করে এটা সত্যি না কল্পনা সে ভালো করে জানেনা। তার ছোট মামার ঘরে সে মাসুষ হয়েছে, মামা মামী তাকে আদরও করতো না অন্যদেরও করতো না। অনেকটা যেন বাসার ফার্নিচারের মতো, ঝেড়ে মুখে রাখতে হয় কিন্তু সেটাকে আদার করতে হয় না ভারোবাসতেও হয় না। সে বড় হয়েছে একা-। একেবারেই একা। তাকে কেউ তার মায়ের কথা বলতো না। তার মায়ে কী হয়েছিলো সে এখনো ভারো করে জানো না, অন্য কোথাও বিয়ে হয়েছিল শুধু সেটুকু সে জানে। তার বিয়ে দেয়া হয়েছিল নাকি পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছিল তা সে কখনো জানতে পারে নি। ঠিক কী করণ তা তার জানা নেই। রাজুর কখনো জানার কৌতুহলও হয় নি।

রাজু একা একটা ঘরে ঘুমাতো। গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠে সে দুই হাতে

নিজের হাঁটু ধরে বসে থরথর করে কাঁপতো। সে শুনতে পেতো কেউ বিকট গলায় চিৎকার করছে। সে জানতো আর কেউ সেই চিৎকার শুনছে না, শুধু সে শুনছে। পাশের ঘরে তার মামী নিচু গলায় কথা বলছেন, বাইরে কেউ একজন বারান্দায় বসে খুক খুক করে কাশছে। তাদের কেউ কিছু শুনছে না, শুধু সে শুনছে কোনো একজন বিকট গলায় চিৎকার করছে। কে কোথায় চিৎকার করছে আর কেউ কেন সেই চিৎকার শুনছে না, কেন শুধু সে শুনছে রাজু সেটা বুঝতে পারতো না। তাই সে ভয়ে থরথর করে কাঁপতো।

তাদের সাথে একটা মেয়ে পড়তো, তার নাম ছিলো শিপ্রা। হঠাৎ করে তারা খবর পেলো শিপ্রা মরে গেছে। কেমন করে মারা গেছে কেউ জানে না, তারা ছোট মানুষ কেউ তাদের কিছু বলে না। সেইদিন রাত্রি বেলা রাজু শুয়ে আছে তখন হঠাৎ করে সে স্পষ্ট শুনতে পেলো শিপ্রা তার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলছে, "বুঝলি রাজু। আমি কিন্তু এমনি এমনি মরি নি। আমাকে আসলে মেরে ফেলেছে।"

রাজু একেবারে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসলো। সারারাত সে ঘুমাতে পারলো না। বিছানায় পা ভাঁজ করে বসে রইল। যখনই তার চোখ একটু বন্ধ হয়ে আসছিলো তখনই সে শুনতে পাচ্ছিলো তার কানের কাছে শিপ্রা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে আর বলছে, "বুঝলি রাজু। আমার একা একা খুব ভয় লাগে। একটু আলো জ্বেলে দিবি? দিবি একটু আলো জ্বেলে?"

যে মানুষ মারা গেছে তার জন্যে কেমন করে আলো জ্বেলে দিতে হয় সে জানতো না, তাই সে কখনো আলো জ্বেলে দিতে পারে নি। কাউকে সে এই কথাটা বলতেও পারে নি। কাকে বলবে? কী বলবে? কেমন করে বলবে?

শুধু যে সে কথা শুনতে পেতো তা নয়– সে মাঝে মাঝে দেখতেও পেতো। রাতে হয়তো গুটি শুটি মেরে শুয়ে আছে হঠাৎ করে তার ঘুম ভেঙ্গে যেতো, মনে হতো ঘরটা বুঝি হিমশীতল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। শুনতে পেতো কেউ খল খল করে হাসছে। তারপর সে শুনতে পেতো ক্যাঁচক্যাঁচ করে জানালাটা খুলে যাচ্ছে, কেউ যেন চেয়ারটা টেনে সরাচ্ছে। ঘরের ভেতর খস খস পায়ের শব্দ শুনতে পেতো, মনে হতো চাপা গলায় কেউ বিড় বিড় করে কথা বলছে। রাজু কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতো, মাঝে মাঝে অনেক সাহস করে সে মাথা বের করে ঘরের মাঝে তাকাতো। দেখতে পেতো কিছু একটা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। মাথাটা অনেক লম্বা সেই ছাদ পর্যন্ত ঠেকেছে।

মাঝে মাঝে মনে হতো ঘরের মাঝে বিকট এক ধরনের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে, পচা মাংশের কিংবা পোড়া চামড়ার এক ধরনের গন্ধ। তার সাথে সাথে সে খলবল খলবল এক ধরনের শব্দ শুনতে পেতো। মনে হতো দাঁত নেই, ঠোঁট নেই, জিব নেই কোনো প্রাণী কথা বলছে। কথাগুলো শুনতে পেতো কিন্তু কিছু বুঝতে পারতো না। এক সময়ে কথাগুলো অস্পষ্ট হয়ে আসতো, ধীরে ধীরে দুর্গন্ধ মিলিয়ে যেতো, চারিদিকে সুনসান এক ধরনের নীরবতা নেমে আসতো।

রাজু কিছু বুঝতে পারতো না, কাউকে কিছু বলতে পারতো না। মাঝে মাঝে মনে হতো সে বুঝি পাগল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে পাগল হয়ে যায় নি, সে যদি বড় একজন মানুষ হতো তাহলে হয়তো পাগল হয়ে যেতে। কিন্তু সে ছিলো ছোট একটি বাচ্চা তাই সে পাগল হয়ে যায় নি, সে শেষ পর্যন্ত এটা নিয়ে বাঁচতে শিখেছিলো। তার একটা কারণও ছিলো– সে যে শুধু ভয়ংকর দৃশ্য দেখতো, বিকট শব্দ শুনতো তা নয়। মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার ঘটতো, হঠাৎ করে তার ছোট ঘরটার মাঝে তীব্র মিষ্টি এক ধরনের গন্ধ ছড়িয়ে পড়তো। শুধু যে মিষ্টি গন্ধ তা নয় রাজুর মনে হতো ঘরের মাঝে বুঝি হালকা নরম একটু আলো ছড়িয়ে পড়েছে। রাজু তখন চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকতো, তার মনে হতো অনেক দূর থেকে একটা মিষ্টি গানের কলি কিংবা একটা মিষ্টি সুর ভেসে আসছে। মনে হতো ঘুরে ঘুরে কেউ একটা কথা বলছে, প্রত্যেকবারই সেটা বলছে একটু অন্যরকম করে। সেটা শুনতে শুনতে রাজুর মাথা ঝিম ঝিম করতো, মনে হতো তার সমস্ত শরীর বুঝি অবশ হয়ে আসছে। সে আবছা আবছা ভাবে দেখতো ধবধবে সাদা কাপড় পরা একটা মেয়ে ঘরের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে, তার কাপড় বাতাসে উড়ছে, চুল বাতাসে উড়ছে। রাজু জোর করে চোখ খুলে সেদিকে তাকিয়ে থাকতো, তার মনে হতো কেউ একজন তার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলছে, "ভয় কী? তোমার ভয় কী?"

রাজু তখন বিড় বিড় করে বলতো, "ভয় নাই?"

"না। কোনো ভয় নাই। রাজু তোমার কোনো ভয় নাই।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। আমরা আছি না? আমরা সবসময় আছি। তোমার আশে পাশে আছি। সবসময় আছি।"

কে আছে রাজু জানতো না। শুধু জানতো 'তারা' তার পাশে আছে। এই

'তারা'টি কে সে বুঝতো না, শুধু জানতো 'তারা' তার কাছাকাছি আছে। 'তারা' তার পাশাপাশি আছে।

রাজু শুনতো কোমল গলায় কেউ তাকে বলছে, "ঘুমাও রাজু! তুমি ঘুমাও।"

রাজুর চোখে তখন ঘুম নেমে আসতো। আধো ঘুম আধো জাগা থাকা অবস্থায় সে দেখতো সেই ঘুরতে থাকা মেয়েটি ঘুরতে ঘুরতে দুটি মেয়ে হয়ে যাচ্ছে। দুটি মেয়ে চারটি মেয়ে হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে সারা ঘরে অসংখ্য মেয়ে দুই হাত দুই পাশে ছড়িয়ে আস্তে আস্তে ঘুরতে থাকতো নরম গলায় গান গাইতে থাকতো। তাদের দেখতে দেখতে, তাদের কথা শুনতে শুনতে রাজুর চোখে ঘুম নেমে আসতো।

এরকম করে রাজু আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠলো। গ্রামের স্কুলে সে ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত পড়লো, পড়ালেখায় তার মন ছিলো না, স্কুলে যেতো আসতো আর পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে যেতো। ক্লাশ সেভেনে তাকে শহরের স্কুলে পাঠিয়ে দেয়া হলো। স্কুলটা এমন কিছু আহামরি ছিলো না কিন্তু স্কুলের লাইব্রেরীটা ছিলো অসাধারণ। সারি সারি আলমারী, সেগুলো বোঝাই হাজার হাজার বই। প্রথম যেদিন লাইব্রেরীটা দেখেছে সেদিন সে ভয়ে ভয়ে একটা আলমারী খুলে একটা বই হাত দিয়েছে, তখন কালো মতোন রাগী রাগী চেহারার একজন মানুষ কড়া গলায় বলল, "কী চাও?"

রাজু বলল, "একটা বই দেখব।"

মানুষটা মুখ খিঁচিয়ে বলল, "বই কী দেখার জিনিষ? বই হচ্ছে পড়ার জিনিষ।"

রাজু ভয়ে ভয়ে বলল, "বই পড়ব।"

রাগী রাগী চেহারার মানুষটার মুখ তখন একটু নরম হলো, বলল, "ঠিক আছে পড়।"

রাজু তখন আলমারী থেকে একটা বই নামিয়ে পড়তে বসল, বইটার নাম তার এখনো মনে আছে, "নীল পাহাড়ের অট্টহাসি।"

সেটা দিয়ে শুধু– তারপর প্রতিদিন সে লাইব্রেরীতে আসতো, আলমারী খুলে বই নামিয়ে বই পড়তো। কালো মতন রাগী রাগী চেহারার মানুষটা তখন রাজুকে দেখলে হাসি হাসি মুখে বলতো, "কোন বইটা পড়বে রাজু?"

রাজু কোনো একটা বইয়ের নাম বলতো, লাইব্রেরীয়ান খুঁজে খুঁজে সেই বই

বের করে দিতো। সেই তখন থেকে রাজুর বই পড়ার অভ্যাস হয়ে গেলো, সেই অভ্যাস তার এখনো আছে। তার বন্ধুরা যখন টেলিভিশনে সিরিয়াল দেখে, ম্যাগাজিনের পাতা উল্টায় সে তখন বই পড়ে।

এই বই পড়ার অভ্যাসের জন্যেই আসলে তার জীবনটা অন্য রকম হয়ে গেলো। সে যখন গ্রামে থাকতো কিংবা শহরের স্কুলে এসে আশেপাশের মানুষজনকে দেখতো, তাদের কাউকে দেখেই সে লেখাপড়া করার কোনো আগ্রহ অনুভব করে নি– সবাই করছে সে জন্যে সেও করছে এরকম একটা ভাব তার ভেতর কাজ করতো। কিন্তু স্কুলের লাইব্রেরীতে সেই বই পড়তে পড়তে হঠাৎ করেই তার লেখাপড়ার জন্যে এক ধরনের আগ্রহের জন্ম নিলো। এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফলটি হলো অসাধারণ, শহরের সেই স্কুলে এর আগে কেউ এতো ভালো করে নি। এতদিনে রাজুর ভেতরে ঢাকার ভালো একটা কলেজে পড়ার একটা সখ জন্মেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা তার কপালে জুটলো না। সেই শহরেরই ছোট একটা কলেজে তাকে পড়তে হলো। সেই কলেজে লেখাপড়ার কোনো পরিবেশই ছিলো না, কলেজের ছেলেরা কলেজের মাস্টারদের কাছে কোচিং পড়তো, যখন কোচিং পড়তো না তখন পাড়ায় পাড়ায় মাস্তানী করে বেড়াতো। রাজুর পুরোপুরি বখে যাওয়ার একটা আশংকা ছিলো কিন্তু সে বখে গেলো না, সেও তার বইয়ের জন্যে ভালোবাসার কারণে।

রাজু শেষ পর্যন্ত ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলো। হলে থাকে, দুই একটা টিউশানী করে। মামা মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠান, স্কলারশীপের কিছু টাকা আসে, মোটামুটি তার দিন চলে যায়।

ইউনিভার্সিটিতে প্রথমদিকে তার বন্ধুবান্ধব সেরকম ছিলো না– মোটামুটি হঠাৎ করেই তার সবার সাথে পরিচয় হয়ে গেলো। তার পিছনেও কারণটা ছিল বই। একদিন ক্লাশে এসে সে পিছনের দিকে বসেছে, যিনি লেকচার দিচ্ছেন তিনি নূতন এসেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক না হয়ে কোনো কর্পোরেট কোম্পানীর ম্যানেজার হলে তাকে ভালো মানাতো। নিজের বিষয়টা সম্পর্কে ভালো ধারণা নেই– নীলক্ষেতের নোট পড়ে ভালো রেজাল্ট করেছেন, অন্যদের থেকে তার মুখস্ত করার ক্ষমতা ভালো ছিল, সঠিক দলের শিক্ষকদের সাথে পরিচয় ছিলো, তাই কপালগুণে শিক্ষক হয়ে গেছেন। বিষয়টা সম্পর্কে তার যেহেতু ভাসা ভাসা জ্ঞান তাই সবসময়েই কেমন যেন সতর্ক থাকেন, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলেই তার

মুখের মাংশপেশী শক্ত হয়ে উঠে, তিনি ভাবতে থাকেন তাকে অপমান করার চেষ্টা করা হচ্ছে, প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে নাজেহাল করার চেষ্টা করেন। তাই ক্লাশে তাকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না। নিরানন্দ এই ক্লাশে ছেলেমেয়েরা অধৈর্য্য হয়ে বসে থাকে, আড়চোখে ঘড়ির দিকে তাকায়, সাবধানে মুখে হাত দিয়ে হাই তুলে। রাজু ক্লাশ শুরু হবার কিছুক্ষণের মাঝেই বুঝে গেলো কাজটা ভালো হয় নি। দরজার কাছাকাছি থাকলে সটকে পড়ার একটা সুযোগ ছিলো কিন্তু যেখানে বসেছে সেখান থেকে বের হবার উপায় নেই। খনিকক্ষণ লেকচার শোনার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে সে ব্যাগ থেকে তার বইটি বের করে পড়তে শুরু করে দিলো। মার্কেজের একটা ছোট গল্পের সংকলন, গল্পগুলোর শুরুটা একটু খটমটে কিন্তু খুব দ্রুত তার মাঝে মগ্ন হয়ে যায়। কমবয়সী লেকচারার হঠাৎ করে আবিষ্কার করলেন একজন ছেলে তার ক্লাশে মগ্ন হয়ে বই পড়ছে। সাথে সাথে তার মুখের মাংশপেশী শক্ত হয়ে গেলো তিনি লেকচার থামিয়ে বললেন, "এই ছেলে।"

রাজু তার কথা শুনতে পেলো না, সে গল্পের শেষ অংশে এসেছে, এক পৃষ্ঠা শেষ করে সে পরের পৃষ্ঠা ওল্টালো।

কমবয়সী লেকচারারের মুখের মাংশপেশী আরো শক্ত হলো, তিনি গলা আরো উঁচিয়ে ধমকে উঠলেন, "এই ছেলে।"

এবারে রাজু তার গলা শুনতে পেলো। চোখ তুলে আবিষ্কার করলো কম বয়সী লেকচারার মুখ শক্ত করে তার দিকে কঠোর চোখে তাকিয়ে আছে। সে বইয়ের পৃষ্ঠা ভাঁজ করে বলল, "জী স্যার।"

"দাঁড়াও।"

রাজু দাঁড়ালো।

"তুমি কী করছ?"

রাজু ইতস্তত করে বলল, "কিছু না স্যার।"

কমবয়সী লেকচারার খেপে উঠলেন, "কিছু না মানে? তোমার হাতে ওটা কী?"

রাজু এবার স্বীকার করল, "একটা বই স্যার।"

"কমবয়সী লেকচারার কেমন জানি খেপে উঠলেন, "তুমি ক্লাশে বসে বই পড়ছ?"

রাজু কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো। কমবয়সী লেকচারার হুংকার দিলেন, "কী বই এইটা?"

"মার্কেজের একটা বই।"

"মা-মার্কেট?"

"না স্যার মার্কেট না। মার্কেজ। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ।"

কমবয়সী লেকচারার এবারে একটু থতমত খেলেন, তিনি ভেবেছিলেন হালকা কোনো বইয়ের নাম হবে। খটমট উচ্চারণের এরকম একটা মানুষের নাম হবে তিনি বুঝতে পারেন নি। মুখ শক্ত করে বললেন, "ক্লাশ ফলো না করে ফালতু বই পড়ছ কেন?"

রাজু একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "ক্লাশে বসে গল্পবই পড়া অপরাধ হতে পারে কিন্তু তাই বলে মার্কেজকে আপনি ফালতু বলতে পারেন না স্যার।"

"কী? কী বললে তুমি?"

"তা ছাড়া আপনি যেটা পড়াচ্ছেন সেই নোট আমাদের সবার কাছে আছে। নীলক্ষেত থেকে কিনেছি- হুবহু সেইটা বোর্ডে লিখছেন স্যার। তাই-"

কমবয়সী লেকচারারের মুখ লাল হয়ে উঠে এবং ক্লাশে একটা চাপা হাসির শব্দ শোনা যায়। রাজু সেটা না শোনার ভান করে বলল, "তাই স্যার লেকচার ফলো না করলে কোনো সমস্যা হবার কথা নয়।"

কমবয়সী লেকচারার এক ধরনের অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে রাজুর দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর নাক দিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "বস।"

রাজু বসে পড়লো এবং বসে আবার বইটা খুলে বসল। কমবয়সী লেকচারার সেটা দেখলেন কী না বোঝা গেল না- তিনি যন্ত্রের মতো পড়িয়ে গেলেন এবং তাকে কেমন যেন বিপর্যস্ত দেখা গেলো।

ক্লাশের শেষে চৈতী রাজুকে বলল, "তুই তো দেখি ডেঞ্জারাস ছেলে।"

রাজু মাথা নাড়ল, বলল, "আমি মোটেও ডেঞ্জারাস না।"

"ক্লাশে বসে মার্কেজ পড়িস- আঁতেল হবার ইচ্ছা?"

রাজু হাসলো, বলল, "মোটেও আঁতেল হবার ইচ্ছা না। পড়ে দেখ।"

"ধুর! বেশি কঠিন।"

"মোটেও কঠিন না। শুরুটা মাঝে মাঝে অন্যরকম-" রাজু তার হাতের বইটা চৈতীর হাতে দিয়ে বলল, "নে পড়ে দেখ। লাস্ট স্টোরিটা পড়-"

চৈতি তার কাছ থেকে বইটা নিলো, গল্পটা শেষ পর্যন্ত পড়েছিলো কী না কখনো জানা গেল না কিন্তু রাজুর সাথে তার পরিচয় হয়ে গেলো।

ক্রিকেট খেলার মাঠ থেকে ছুটে পালিয়ে রাজু আর তার সাথে বসে থাকা সবাই শাহবাগের একট ফাস্ট ফুডের দোকানে এসেছে, সবার ভেতরে একরকম উত্তেজনা। নানারকম গুজব ডালপালা নিয়ে ছড়িয়েছে। সবাই বসে বসে সেগুলো খানিকক্ষণ যাচাই বাছাই করে উঠে গেলো, বসে রইল শুধু রাজু আর চৈতী। চৈতী তার কফিতে চুমুক দিয়ে রাজুর দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা রাজু– তুই আমাকে একটা কথা বলবি?"

"কী কথা?"

"যখন খেলার মাঠে বোমা পড়ল– আমরা সবাই দৌড়ে পালিয়ে এলাম তুই তখন ধন্ধ মেরে বসে রইলি কেন?"

"না মানে ইয়ে–" রাজু ইতস্তত করে বলল, "আসলে হয়েছে কী–"

"শুধু যে পরে বসে রইলি তা নয়– আগেও দেখলাম তুই কেমন জানি আউলা ঝাউলা মেরে বসে থাকলি–"

রাজু স্থির চোখে চৈতীর চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "তুই আসলেই জানতে চাস?"

"হ্যাঁ।"

"কাউকে বলবি না তো?"

"বলব না?" চৈতী অবাক হয়ে বলল, "কী বলব না?"

"তোকে যেটা বলব সেটা কাউকে বলবি না তো?"

"আগে বল–"

"আগে কথা দে কাউকে বলবি না।"

চৈতী বলল, "ঠিক আছে কথা দিলাম।"

রাজু একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "আমি মাঝে মাঝে কিছু জিনিষ আগে থেকে বলতে পারি।"

চৈতী ভুরু কুঁচকে বলল, "আগে থেকে বলতে পারিস?"

"হ্যাঁ। বোমা পড়ার ঠিক আগে আমি বুঝতে পেরেছিলাম ভয়ংকর কিছু হবে। বুঝতে পেরেছিলাম–"

"কী বুঝতে পেরেছিলি?"

"কেউ একজন মারা যাবে।"

চৈতী কেমন একটা চোখে রাজুর দিকে তাকিয়ে রইল। রাজুর কথা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হলো না। রাজু গম্ভীর গলায় বলল, "শুধু যে আমি আগে থেকে বুঝতে পারি তা না– আমি মাঝে মাঝে কথা শুনতে পাই।"

"কার কথা?"

"জানি না।"

"কী বলে?"

"সব কথা বুঝতে পারি না। কিছু কিছু বুঝি, কিছু কিছু বুঝি না।"

চৈতী স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ রাজুর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "স্কিতজোফ্রেনিয়া।"

রাজু হাসলো, বলল, "আমি জানতাম। তুই এটা বলবি!"

"যারা স্কিতজোফ্রেনিয়ার রোগী তারা কথা শুনতে পায়।"

"আমি জানি। তবে স্কিতজোফ্রেনিয়ার রোগীর সাথে আমার একটা পার্থক্য আছে।"

"কী পার্থক্য?"

"স্কিতজোফ্রেনিয়ার রোগীরা যেটা শুনতে পায় সেটা ঘটে না। আমি যেটা শুনতে পাই সেটা ঘটে।"

চৈতী টেবিলে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "আমার কী ঘটবে, বল দেখি!"

রাজু হাসলো, বলল, "আমি সবার কথা বলতে পারি না।"

"চেষ্টা করে দেখ।"

"চেষ্টা করে লাভ নেই।"

"তোর এতো বড় অলৌকিক ক্ষমতা, দেখ চেষ্টা করে।"

রাজু গম্ভীর গলায় বলল, "ঠাট্টা করছিস?"

চৈতী মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। তুই যদি মনে করিস তুই খুব সিরিয়াস মুখ করে আজগুবি আজগুবি কথা বলবি আর আমি সেইসব কথা বিশ্বাস করে বসে থাকব, তাহলে শুনে রাখ– আমি এইসব বিশ্বাস করি না। তোর কী করতে হবে জানিস?"

"কী?"

"একজন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। সেই ডাক্তারের দেয়া ওষুধ খেতে হবে। খেয়ে সুস্থ হতে হবে। বুঝলি?"

"বুঝেছি।"

দুই দিন পর চৈতী রাজুকে একটা কার্ড দিয়ে বলল, "এই নে।"

"কী এটা?"

"একটা কার্ড।"

"সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। কীসের কার্ড?"

"ডাক্তারের। ডক্টর মুশফিক। সাইকিয়াট্রিক। কর্নেল থেকে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজীতে ডিগ্রী করে এসেছে।"

রাজু হেসে ফেলল, বলল, "পাগলের ডাক্তার?"

"তুই যদি এভাবে বলে আরাম পাস তাহলে তাই।"

"আমি কী করব?"

"তুই যাবি।"

"কেন?"

"চিকিৎসার জন্যে।"

রাজু গম্ভীর হয়ে বলল, "আমার চিকিৎসার জন্যে তোর এতো মাথা ব্যথা দেখে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু–"

"ঢং করবি না।" চৈতী মুখ শক্ত করে বলল, "যা বলছি তাই কর। এপয়েন্টমেন্ট করে যা। খুব ভালো ডাক্তার।"

রাজু বলল, "তুই বুঝতে পারছিস না চৈতী। আমার সমস্যাটা স্কিতজোফ্রেনিয়া না–"

চৈতী গলা নামিয়ে বলল, "পৃথিবীর সব স্কিতজোফ্রেনিয়ার রোগী মনে করে তার সমস্যাটা স্কিতজোফ্রেনিয়া না।"

রাজু এবার হাল ছেড়ে দিলো।

এরপর যখনই রাজুর সাথে চৈতীর দেখা হলো চৈতী জিজ্ঞেস করে, "গিয়েছিলি?"

রাজু মাথা নাড়ে, বলে, "না।"

রাজু শেষ পর্যন্ত ডক্টর মুশফিকের সাথে একটা এপয়েন্টমেন্ট করে একদিন তার চেম্বারে হাজির হলো। খুব সাজানো গোছানো চেম্বার। বাইরে ওয়েটিং রুমে যারা বসে আছে তাদের দিকে তাকালে কোনো অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে না। তবে একটু ভালো করে তাকালে এক ধরনের অস্থিরতা চোখে পড়ে যেটা সবাই চেপে রাখার চেষ্টা করছে।

তেরো চৌদ্দ বছরের একটি মেয়েকে নিয়ে তার মা এসেছেন। মেয়েটি পিঠের মেরুদণ্ড সোজা করে শক্ত হয়ে বসে আছে, পাশে তার মায়ের চোখে মুখে এক ধরনের হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গী। এক সময় ডক্টর মুশফিকের নার্স মা ও মেয়েকে ডেকে নিলো– মেয়েটি নিজে থেকে উঠতে চাইছিলো না। মা তার হাত ধরে উঠিয়ে নিয়ে গেলো। দীর্ঘসময় পর যখন মা আর মেয়ে বের হয়ে এলো তখনো মা তার মেয়ের হাত ধরে রেখেছে। ভাবলেশহীন মেয়েটির হাত ধরে মা চেম্বার থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই রাজুর ভেতরে ডাক পড়লো।

ডক্টর মুশফিকের ঘরটি বেশ বড় এবং খুব সুন্দর করে সাজানো। রাজু ভেবেছিলো সিনেমায় যেরকম দেখেছে সেরকম ভেতরে লাল রংয়ের সোফা হবে, কিন্তু তা নেই। বড় ডেস্কের সামনে সুন্দর নরম আরামদায়ক চেয়ার।

রাজু ঘরে ঢুকে লক্ষ করলো সে একটু আগে যে ফর্মটি পূরণ করে দিয়েছে ডক্টর মুশফিক সেটা মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। তাকে দেখে ফর্ম থেকে মুখ তুলে বলল, "আপনি রাজু?"

"জী।"

"বসেন।"

রাজু নরম চেয়ারে বসে ডক্টর মুশফিকের দিকে তাকালো। ডক্টর মুশফিক মুখে খুব মাপা কৃত্রিম একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, "আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি রাজু সাহেব?"

রাজু একটু ইতস্তত করে বলল, "আমি ঠিক কীভাবে বলব বুঝতে পারছি না।"

"চেষ্টা করেন।" ডক্টর মুশফিক বলল, "নিশ্চয়ই বলতে পারবেন।"

রাজু বলল, "আমি মাঝে মাঝে এক ধরনের কথা শুনতে পাই–"

ডক্টর মুশফিক সবকিছু বুঝে ফেলেছেন এরকম ভঙ্গী করে মাথা নাড়তে লাগলেন।

"শুধু যে কথা শুনতে পাই তা না। মাঝে মাঝে গন্ধ পাই। বেশীরভাগ সময়ে পচাগন্ধ তবে মাঝে মাঝে মিষ্টি গন্ধ। কখনো কখনো দেখতেও পাই−"

ডক্টর মুশফিক তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "আপনার রাতে ঘুম হয়?"

"হ্যাঁ হয়।"

"কতো ঘণ্টা ঘুমান আপনি?"

রাজু একটু হাসার ভঙ্গী করে বলল, "এলার্ম ছাড়া ঘুমালে মাঝে মাঝেই উঠতে দেরী হয়ে যায়। ঘুম নিয়ে আমার সমস্যা নেই।"

"ঘুমের ট্যাবলেট?"

"না।"

"অন্য কোনো মেডিকেশন?"

"না।"

"পরিবারে কোনো মানসিক রোগী?"

"আমার জানামতে কেউ নেই।"

ডক্টর মুশফিক আবার মাথা নাড়লেন। মাথা নেড়ে আবার রাজুকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। নানা রকম প্রশ্ন− রাজুর সমস্যার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এরকম প্রশ্ন। প্রশ্ন শুনে মনে হতে পারে ডক্টর মুশফিক রাজুর একেবারে নিজস্ব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চাইছেন, তাকে সন্দেহ করছেন, তাকে অপমান করার চেষ্টা করছেন। মাঝে মাঝেই রাজুর মেজাজ গরম হয়ে উঠছিলো কিন্তু সে খেপে উঠল না। ধৈর্য্য ধরে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিল।

একসময়ে ডক্টর মুশফিক প্রশ্ন করা শেষ করলেন তারপর কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করলেন। হাতের পেন্সিলটা টেবিলে কয়েকবার ঠুকলেন তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। রাজু কী করবে ঠিক বুঝতে না পেরে চুপচাপ বসে রইল।

ডক্টর মুশফিক শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন, বললেন, "রাজু সাহেব, আমি আসলেই খুব খুশী হয়েছি যে আপনি আমার কাছে এসেছেন। সাধারণত যাদের সমস্যা থাকে তারা স্বীকার করতে চায় না যে তাদের সমস্যা আছে। তারা প্রফেশনাল হেল্প নিতে চায় না। ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না।"

রাজু বলল, "আসলে আমিও আসতে চাচ্ছিলাম না। আমার ক্লাশফ্রেন্ড আছে চৈতী, সে আমাকে জোর করে আপনার কাছে পাঠিয়েছে।"

ডক্টর মুশফিক উজ্জ্বল মুখে বললেন, "ও! তুমি চৈতীর ফ্রেন্ড! তাহলে আমি তোমাকে রাজু সাহেব কেন ডাকছি? আপনি করে কেন বলছি?"

রাজুকে কেউ যদি তুমি করে বলে তাহলে সে খুব বিরক্ত হয় কিন্তু এখন এখানে তার কিছু করার নেই, তাকে ভদ্রতা করে বলতেই হলো, "অবশ্যই! অবশ্যই।"

"রাজু, আমি খুশী হয়েছি যে তুমি আমার কাছে এসেছ। তোমার সমস্যাটা ঠিক করে ডায়াগনসিস করতে আমাদের আরো কয়েকটা সিটিং করতে হবে। আমি মোটামুটি সমস্যাটা ধরতে পেরেছি। এটা এক ধরনের ডিজঅর্ডার। স্কিতজোফ্রেনিয়া নানারকম হয়, তার একটা ভার্সান। তবে আমরা এখন এটাকে আর সেরকম ভয় পাই না। তার কারণ হচ্ছে কিছু নূতন ড্রাগস বের হয়েছে– অসম্ভব ভালো। আগে যে সব রোগীদের সারা জীবন ইনস্টিটিউশনে কাটাতে হতো তারা এখন ফেমিলির সাথে থাকতে পারে। তবে–"

ডক্টর মুশফিক একটা নাটকীয় ভঙ্গী করে থেমে গেলেন। রাজু বলল, "তবে?"

"তবে ড্রাগসগুলো খুব ভালো করে মনিটর করতে হয়। কারো কারো জন্যে ড্রাগসগুলো খুব ভালো কাজ করে আবার কারো কারো জন্যে সেগুলো সেরকম ভালো করে কাজ করে না। তা ছাড়া নূতন বের হয়েছে বলে ড্রাগসগুলো পাওয়াও যায় না। যদি বা পাওয়া যায় তাহলে সেটা হয় খুবই এক্সপেনসিভ–"

ঠিক তখন হঠাৎ একটা অত্যন্ত বিচিত্র ঘটনা ঘটলো। হঠাৎ করে দরজা খুলে একজন বৃদ্ধা মহিলা চিৎকার করে ঘরের ভেতর ঢুকলেন, তার সারা শরীর রক্তে ভেজা– মাথার পিছনটা পুরোপুরি থেতলে গেছে। মহিলা ডক্টর মুশফিকের কাছে গিয়ে হাহাকার করে বললেন, "মুশু বাবা দেখ! আমার কী হয়েছে! দেখ–"

ডক্টর মুশফিক মাথা থেতলে যাওয়া, রক্তে ভেসে যাওয়া বৃদ্ধা মহিলাটাকে দেখতে পেলেন না, তার হাহাকারের মতো কথাও শুনতে পেলেন না। তিনি রাজুর দিকে তাকিয়ে কথা বলতে থাকলেন।

"তবে আপাতত আমরা ওষুধের কষ্ট নিয়ে মাথা না ঘামালাম। আগে দেখা যাক কোনটা তোমাকে স্যুট করে। অল্পডোজ দিয়ে শুরু করব–"

রাজু দেখল বৃদ্ধা মহিলা তার পাশের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলছেন, "মুশু। এই মুশু–"

রাজু তখন তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, ডক্টর মুশফিক অবাক হয়ে বলল, "কী হলো।"

"আপনার মা মারা গেছেন।"

"কী বললে?"

"বলেছি আপনার মা মারা গেছেন।"

ডক্টর মুশফিক চমকে উঠে বললেন, "কী বলছ এসব?"

"জী। আপনি খোঁজ নেন। একসিডেন্টে।"

ডক্টর মুশফিক জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, "দেখো রাজু, তুমি আমার পেশেন্ট। তোমার আর আমার মাঝে এক ধরনের সম্পর্ক থাকতে হবে–"

রাজু দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, "আপনার এখন সেখানে যাওয়া দরকার।"

ডক্টর মুশফিক কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, রাজু কোনো সুযোগ না দিয়ে বের হয়ে গেলো। বের হবার সময় শুনতে পেলো একটা টেলিফোন বাজছে। টেলিফোনের শব্দের মাঝে সবসময় এক ধরনের ব্যাকুলতা থাকে, এক ধরনের গোপন আতংক লুকিয়ে থাকে। ডক্টর মুশফিক টেলিফোনটা ধরার আগেই রাজু তার চেম্বার থেকে বের হয়ে পথে নেমে গেলো।

পরদিন চৈতী রাজুকে খুঁজে বের করলো, রাজু কাফেটেরিয়ার এক কোণায় বসে টনি মরিসনের একটা বই পড়ছিলো। চৈতী তার সামনের চেয়ারে বসে থমথমে গলায় বলল, "রাজু।"

"কী হলো চৈতী?"

চৈতী কিছুক্ষণ রাজুর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর জিজ্ঞেস করল, "রাজু– তুই আমাকে বোঝা।"

"কী বোঝাবো?"

"ডক্টর মুশফিকের চেম্বারে কী হয়েছিলো?"

"ও!"

চৈতী একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "ডক্টর মুশফিক সম্পর্কে আমার দূর সম্পর্কের মামা। তার মা একসিডেন্টে মারা গেছেন সেটা নিয়ে ডক্টর মুশফিক যেটুকু আপসেট তার থেকে বেশি আপসেট তোকে নিয়ে।"

"আমি কী করেছি?"

"তুই ডক্টর মুশফিককে বলেছিস তার মা মারা গেছেন।"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করে বলেছিস?"

রাজু বইয়ের ভেতরের পৃষ্ঠা ভাঁজ করে বইটা টেবিলে রেখে বলল, "আমি তোকে বলেছিলাম, আমি কেমন করে বলি। তুই আমার কথা বিশ্বাস করিস নি।"

"তুই আসলেই কথা শুনতে পাস? কোনোকিছু দেখতে পাস?"

"হ্যাঁ। তুই বলেছিস সেটা স্কিতজোফ্রেনিয়া, ওষুধ খেলে সেরে যাবে। তোর ডাক্তার সেই একই কথা বলেছে। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"স্কিতজোফ্রেনিয়ার রোগীর সবকিছু হচ্ছে এক ধরনের কল্পনা। আমারগুলো বাস্তব। এই হচ্ছে পার্থক্য।" রাজু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "দেখ চৈতী, আমি যে কথাবার্তা শুনি, মানুষজন দেখি সেটা আমার ভালো লাগে না। একেবারেই ভালো লাগে না— ওষুধ খেয়ে এটা যদি বন্ধ করা যায় আমি ওষুধ খেতে রাজী আছি। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"এগুলি ভয়ংকর ওষুধ। মাথার ভিতরে সব ওলটপালট করে দেবে। আমি আমার মাথার ভেতরে সবকিছু ওলটপালট করতে চাই না।"

চৈতী মাথা নাড়ল, বলল, "রাজু। তোর এটা স্কিতজোফ্রেনিয়া না। এটা তোর এক ধরনের ক্ষমতা। অলৌকিক ক্ষমতা।"

রাজু কোনো কথা না বলে চৈতীর দিকে তাকিয়ে রইল। চৈতী বলল, "আমি যদি নিজের চোখে এটা না দেখতাম, তোকে যদি না চিনতাম এটা বিশ্বাস করতাম না।"

রাজু বলল, "আমিও বিশ্বাস করতাম না।"

"এটার নিশ্চয়ই কোনো ব্যাখ্যা আছে।"

"নিশ্চয়ই আছে।"

"আমি এতোদিন ভাবতাম মানুষ মরে গেলেই শেষ, এখন মনে হচ্ছে মরে গেলেই শেষ না। মানুষের আত্মা বলে কিছু একটা থেকে যায়—"

রাজু বলল, "উল্টোটাও হতে পারে। আত্মা বলে কিছু নেই— আমি বিচিত্র জিনিষ দেখি। ঘটনাক্রমে সেসব মিলে যায়।"

"তার সম্ভাবনা কতো কম জানিস?"

"জানি। কিন্তু কম সম্ভাবনার জিনিষ ঘটে না তোকে কে বলেছে?" রাজু। তুই আমার সম্পর্কে কিছু বলতে পারনি?"

রাজু শব্দ করে হেসে বলল, "তা চৈতী। তুই একসিডেন্টে মরে গেলে তোকে হয়তো দেখে ফেলব, কিন্তু তুই যতক্ষণ বেঁচে আছিস আমি কিছু বলতে পারব না"

"চেষ্টা করে দেখ না।"

"ইহুঁ। দেখব না"

"কেন দেখবি না?"

তার কারণ আমি জানি না কেমন করে চেষ্টা ককরতে হয়। তাছাড়া-"

"তাছাড়া?"

"তাছাড়া আমি অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন দালাইলাম টাইপের একজন হতে চাই না। আমি নরমাল মানুষ হতে চাই-"

ঠিক এই সময় তাদের ক্লাসের দুইজন হাতে চায়ের কাপ নিয়ে তাদের দিকের এগিয়ে আসে, "আরে তোরা এইখানে- ক্লাসে যাবি না?"

"ধুর! মজা লাগে না! তুইতো সেদিন বলেই দিয়েছিস, নীলক্ষেত থেকে সোট কিনে নিলে আর ক্লাস করতে হয় না!"

সাবাই তখন দুলে দুলে কিছুক্ষণ হাসে। অকারণেই।

প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস থেকে বের হয়ে রাজু দেখলো ছোট টকটা বাচ্চা কোলে নিয়ে একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। মহিলা না বরে হয়তো তরুণী বলাই ঠিক- বয়স খুব বেশি নয়। রাজুকে বের হতে দেখে মহিলাটি বাচ্চাটাকে বগলের মাঝে ধরে তার দিকে এগিয়ে এলো, জিজ্ঞেস করল, "আপানর নাম রাজু?"

রাজু বলল, "হ্যাঁ।"

"আমি কী আনার সাথে একটু কথা বলতে পারি?"

রাজু একটু অবাক হয়ে বলল, "আমার সাথে"

"হ্যাঁ"

"কী নিয়ে কথা বলবেন?"

মহিলাটি বাচ্চাটাকে বগল থেকে সরিয়ে ঘাড়ে তুলে নিলো, বাচ্চাটি সেই অবস্থায় আঁকুপাঁকু করে নড়তে থাকে। এরকম চমৎকার হাসিখুশী বাচ্চা কম দেখা যায়, মহিলাটি তাকে ঘাড়ে রেখে বলল, "সবচেয়ে ভালো হয় যদি আমরা কোথাও বসতে পারি।"

"কোথায় বসতে চান?"

"আপনার যদি সময় থাকে তাহলে কোনো একটা ফাস্টফুডের দোকানে বসতে পারি। শাহবাগের দিকে ভালো একটা কফি হাউস আছে।"

"শাহবাগে?"

"হ্যাঁ। আমার সাথে গাড়ী আছে। যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে-"

রাজু বলল, "না না! আপত্তি কীসের? আপত্তি নেই।"

মহিলাটি বাচ্চাটাকে আবার বগলদাবা করে হাঁটতে থাকে। বাচ্চাটি তার ছোট হাত দুটো একসাথে মুখে ঢোকানোর চেষ্টা করতে থাকে- ঢোকাতে না পেরেও সে বিরক্ত হয় না, মুখ থেকে লোল ফেলতে ফেলতে সে মাড়ি দিয়ে তার হাত দুটো কামড়াতে চেষ্টা করতে থাকে। সত্যি কথা বলতে কী রাজু এর আগে কখনো কোনো ছোট বাচ্চাকে এভাবে দেখে নি। শিশুটিকে দেখে সে প্রথমবার বুঝতে পারে একটা ছোট শিশুর মতো মজার একটা বস্তু পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই।

রাজু মহিলাটির পিছে পিছে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসে। সামনেই টুকটুকে লাল রঙয়ের একটা গাড়ী, গাড়ীর ড্রাইভিংসিটে কালো চশমা পরা একজন কমবয়সী মানুষ বসে আছে। মানুষটি সুদর্শন, গায়ে নীল রংয়ের একটা টি শার্ট। আটো সাটো টি শার্টের ভেতর দিয়ে মানুষটার পেটা শরীরটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

রাজু খুব বেশি গাড়ীতে ওঠে নি। গাড়ীর কোন সিটে কার বসার নিয়ম সে জানে না, তাই সে তাকে কোথায় বসতে বলা হবে সেটার জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে। মহিলাটি বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে রাজুকে গাড়ীর পিছনে বসতে বলল। বাচ্চাটি মেয়েটির ঘাড়ের ওপর দিয়ে রাজুর দিকে তাকিয়ে তার দুই হাত নাড়তে থাকে, দেখে মনে হয় রাজুকে নিয়ে তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে, শুধু পরিকল্পনাটি কী সেটা বোঝাতে পারছে না! ছোট বাচ্চা এতো মজার জিনিষ রাজু আগে কখনো লক্ষ্য করে দেখে নি।

গাড়ীটা ছেড়ে দিলো। তরুণীটি বাচ্চাটাকে ধরে রেখে বলল, "আপনাকে আমার নাম বলা হয় নি, আমার নাম নীরা।"

রাজু বলল, "ও আচ্ছা।"

এই মুহূর্তে পুরুষ মানুষটিরও নিজের নাম বলা উচিৎ ছিলো কিন্তু সে কোনো কথা বলল না। রাজু বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে বলল, "ওর নাম কী?"

"বাপ্পী ডাকি। ভালো একটা নাম দিতে হবে।"

রাজু বলল, "বাপ্পীই তো যথেষ্ট ভালো নাম। বয়স কতো?"

"চার মাস।"

"চার মাসের বাচ্চার কতো এনার্জী দেখেছেন। এক সেকেন্ডও সে চুপচাপ বসে নেই। কিছু না কিছু করছে।"

নীরা নামের মেয়েটি মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। ছোট বাচ্চাদের নিয়ে এটাই সমস্যা! ওদের ধরে রাখা যায় না– মাঝে মাঝে টায়ার্ড হয়ে যাই।"

রাজু কখনো কোলে ছোট বাচ্চাকে ধরে নি, বাপ্পীকে দেখে কেমন জানি লোভ হচ্ছিল, বলল, "ও কী আমার কাছে আসবে? তাহলে আমি কোলে নিয়ে দেখতাম।"

নীরা বলল, "বাপ্পী সবার কাছে যায়। কোনো বাছ বিচার নেই। এই নেন।" বলে নীরা সীটের উপর দিয়ে বাপ্পীকে রাজুর কাছে ধরিয়ে দিলো।

রাজু বাপ্পীকে তার কোলে বসিয়ে নিলো। বাচ্চাটা কোলে বসে তার একটা হাত নাড়তে নাড়তে মুখ দিয়ে বিচিত্র একটা শব্দ করতে থাকে!

শাহবাগের সামনে গাড়ীটা পার্ক করে তারা গাড়ী থেকে নেমে আসে, একটা ফাস্টফুডের দোকানে ঢুকে তারা খালি একটা টেবিলে বসল। নীরা জিজ্ঞেস করল, "কী খাবেন?"

রাজুর খুব খিদে পেয়েছিলো কিন্তু সে বলল, "কিছু খাব না।"

"চা কফি?"

খালি পেটে চা কফি খেতে চাইছিলো না কিন্তু তারপরেও মাথা নেড়ে বলল, "কফি।"

কালো চশমা পরা মানুষটি নীরার পাশে পিঠ সোজা করে বসে রইল, এখন পর্যন্ত সে একটি কথাও বলে নি। ফাস্টফুডের দোকানের ভেতরে আবছা অন্ধকার। এখানে এসেও সে তার কালো চশমাটি খুলে নি। মানুষটিকে এখন আর নীরার স্বামী বলে মনে হচ্ছে না, একজন বডিগার্ড মনে হচ্ছে।

রাজু আর অপেক্ষা না করে আলোচনা শুরু করে দিতে চাইল। বলল, "আপনারা কী একটা বিষয়ে জানি কথা বলবেন বলেছিলেন!"

"ও হ্যাঁ!" নীরা মাথা নাড়ল, বলল, "ব্যাপারটা কী তা আপনাকে বলি।"

বাপ্পী কীভাবে কীভাবে জানি একটা চামুচ ধরে ফেলেছে, সেটা দিয়ে সে মহানন্দে টেবিলে শব্দ করতে থাকে। নীরা তার হাত থেকে চামুচটা সরিয়ে নিয়ে বলল, "আমরা খবর পেয়েছি আপনি নাকি কিছুদিন আগে একজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন। সেই ডাক্তারকে বলে দিয়েছিলেন তার মা মারা গেছে একসিডেন্টে?"

রাজু অস্বস্তিতে একটু নড়ে চড়ে বসল, তার জীবনের এই অংশটুকু সে দশজনের কাছে বলে বেড়াতে চায় না। কিন্তু এখন সেটা অস্বীকার করা যাবে না, রাজু তাই মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"যারাই শুনেছে তারাই খুব অবাক হয়েছে। আমরা মোটেও অবাক হই নি।"

রাজু এবারে একটু অবাক হলো, "আপনারা অবাক হন নি?"

"না। মানুষের একটা পার্সেন্টেজের ভেতরে এই ক্ষমতা থাকে। একটা পার্সেন্টেজ যেমন অটিস্টিক হয়, একটা পার্সেন্টেজ যেমন স্কিতজোফ্রেনিক হয় ঠিক সেরকম একটা পার্সেন্টেজের এক ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা থাকে। আপনি হচ্ছেন সেই রকম একজন মানুষ।"

রাজু একটু ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু আপনারা আমাকে কেন ডেকেছেন?"

"আমরা আসলে এই বিষয়ে গবেষণা করি। বাইরে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এর উপরে ডিপার্টমেন্ট আছে। প্যারা সাইকোলজি বলে– আমাদের দেশে আছে শুধু কুসংস্কার। পুরো বিষয়টাকে ভূতপ্রেতের ব্যাপার বলে ভাবা হয়। আমরা প্রথম এই বিষয়টা একটু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চাই।"

রাজু মাথা নেড়ে বলল, "আচ্ছা!"

"সেজন্যে আপনার একটু সাহায্য দরকার।"

"আমাকে কী করতে হবে?"

"কিছু না– আমরা আপনাকে ডাকব। কোনো দিন সকাল বেলায় আমাদের সাথে বসবেন। ঘণ্টা দুয়েক আমরা কথা বলব। আপনি আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন আমরা সেটাকে লিখে রাখব। এই রকম ব্যাপার।"

"ঠিক আছে।" রাজু মাথা নাড়ল, বলল, "আসলে ব্যাপারটা ঠিক কী

আমারও সেটা জানার ইচ্ছে আছে– আপনারা এটা নিয়ে স্টাডি করেন জানতাম না। আমারও মনের ভেতরে অনেক প্রশ্ন আছে, আপনাদের কাছে তার জবাব চাইব।"

নীরা মাথা নেড়ে বলল, "অবশ্যই! অবশ্যই।"

এরপর রাজু আরও বেশ কিছুক্ষণ নীরার সাথে কথা বলল এবং পুরো সময়টাই কালো চশমা পরা মানুষটা পিঠ সোজা করে বসে রইলো, একটা কথাও বলল না। আলোচনায় সশব্দে যে যোগ দিলো সেটি হচ্ছে বাপ্পী! সে দুই হাত পা নেড়ে সারাক্ষণই পুরোপুরি নিজের ভাষায় কথা বলে গেলো।

ছোট বাচ্চারা যে এরকম অসাধারণ একটা মজার ব্যাপার রাজুর কাছে সেটা মোটেও জানা ছিলো না।

"বুঝলি চৈতী, পৃথিবীর সবচেয়ে অসাধারণ জিনিষ কী?"

চৈতী আর রাজু সিঁড়িতে বসে অলস দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের আসা যাওয়া দেখছিলো। ঘন্টাখানেক পরে একটা মিডটার্ম পরীক্ষা হবে সেটা নিয়ে দুজনের ভিতরেই খানিকটা দুর্ভাবনা। হঠাৎ করে তার মাঝে পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিকভাবে রাজু চৈতীকে এই পৃথিবীর সবচেয়ে অসাধারণ জিনিষ কী সেটা নিয়ে প্রশ্নটি করেছে।

চৈতী ভুরু কুঁচকে বলল, "কী?"

"ছোট বাচ্চা। একেবারে গেন্দা বাচ্চা।"

চৈতী একটু অবাক হয়ে বলল, "গেন্দা বাচ্চা? তুই কোথায় গেন্দা বাচ্চা দেখছিস?"

"একজন এসেছিলো আমার কাছে তার সাথে একটা গেন্দা বাচ্চা ছিলো। আমি আগে কখনই একটা গেন্দা বাচ্চাকে ভালো করে লক্ষ করি নি। তারা হচ্ছে অসাধারণ!"

"কেন? অসাধারণ কেন?"

"প্রধান কারণ হচ্ছে চোখ। এই এতো বড় বড় চোখ দিয়ে তারা তাকায়।

সেই চোখের দৃষ্টির কোনো তুলনা নেই। তারপর মনে কর তার কাজ কর্ম। দুই হাত মুঠি করে নিজের মুখে ঢোকানোর চেষ্টা করে– কেন চেষ্টা করে সেটা একটা রহস্য। তারপর মনে কর তার হাসি, হঠাৎ করে তোর দিকে তাকিয়ে থেকে একটা হাসি দেবে, দাঁত নেই শুধু মাড়ি। সেই হাসির কোনো তুলনা নেই। আমার কী মনে হয় জানিস?"

"কী?"

"পৃথিবীর যতো খারাপ লোক আছে, গুণ্ডা বদমাইস চোর ডাকাত তাদের সবাইকে যদি একটা ছোট বাচ্চার সামনে বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেই মানুষগুলো ভালো হয়ে যাবে!"

চৈতী হেসে ফেলল, বলল, "ব্যাপারটা খারাপ হয় না। মনে কর একটা ডাকাতের বিচার হচ্ছে। জজ রায় দিল, চার বছর জেল এবং প্রতিদিন একঘণ্টা করে ছোট শিশুর সামনে বসে থাকা!"

"আমার কী মনে হয় জানিস?"

"কী?"

"সবাই যদি দিনে কিছুক্ষণ ছোট একটা বাচ্চার সামনে বসে কাটায় তাহলে এই পৃথিবীতে আর কোনো খারাপ মানুষ থাকবে না। একটা ছোট বাচ্চা কীভাবে নিজে নিজে কথা বলে, দেখেছিস? একেবারে অসাধারণ!"

রাজুর কথা বলার ভঙ্গী দেখে চৈতী আবার একটু হাসলো। বলল, "বুঝেছি।"

"কী বুঝেছিস?"

"তোর এখন বিয়ে করে সংসারী হবার সখ হয়েছে! বছর বছর তোর বউয়ের একটা করে বাচ্চা হবে আর তুই তোর সব কাজ কর্ম ফেলে তোর বাচ্চাদের মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকবি!"

রাজু মাথা নাড়ল, বলল, "কথাটা খারাপ বলিস নি!"

"যদি এতো ধৈর্য্য না থাকে তাহলে যার ছোট বাচ্চা আছে কিন্তু স্বামী নাই খুঁজে পেতে সেরকম কাউকে বিয়ে করে ফেল তাহলে বাচ্চার জন্যে আর অপেক্ষাও করতে হবে না! রেডিমেড বাচ্চা পেয়ে যাবি।"

কথা শেষ করে চৈতী হি হি করে হাসতে থাকে। রাজু চৈতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, হাসি ব্যাপারটা সংক্রামক– একটু পরে সে নিজেও হাসতে শুরু করে।

ঠিক এক সপ্তাহ পর দুপুর বেলা রাজু একটা টিউটরিয়াল ক্লাশ থেকে বের হয়েছে, দেখে বাইরে নীরা দাঁড়িয়ে আছে। নীরা ঠিক আগের মতো বাচ্চাটিকে ধরে রেখেছে, বাচ্চাটি হাত পা নেড়ে আঁকুপাঁকু করছে। রাজু একটু এগিয়ে গেলো, বলল, "আপনি?"

"হ্যাঁ। আমি।" নীরা সুন্দর করে হেসে বলল, "মনে আছে আপনাকে একদিন আমাদের সাথে একটু যেতে বলেছিলাম?"

"হ্যাঁ।"

"আজ কী যেতে পারবেন? ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে?"

রাজু ক্লাশ রুটিনটা মনে করার চেষ্টা করল, পুরোপুরি মনে করতে পারল না কিন্তু বেশ ব্যস্ত যে সেটুকু মনে করতে পারল। বলল, "আজকের দিনটা ভালো না।"

"তাহলে আধাঘণ্টা সময় দিতে পারবেন? আমেরিকা থেকে আমাদের একজন এক্সপার্ট এসেছে তার সাথে আপনার একটু পরিচয় করিয়ে দিই।"

নীরার বগলে ঝুলে থাকা বাপ্পী নামের ছোট বাচ্চাটি ঠিক এরকম সময়ে তার দিকে তাকিয়ে তার দাঁতহীন মাড়ি বের করে একটা হাসি দিলো এবং মনে হয় সেজন্যেই রাজু বলল, "ঠিক আছে তাহলে এখনই যাই। একঘণ্টার মাঝে ফিরে আসতে পারব তো?"

নীরা সুন্দর করে হেসে বলল, "অবশ্যই। আমি নিজে আপনাকে পৌঁছে দেব!"

রাজু বলল, "তাহলে চলেন।"

নিচে নেমে সে দেখতে পায় বড় একটা সাদা গাড়ী পার্ক করে রাখা আছে। নীরা রাজুর জন্যে পিছনের দরজাটা খুলে দিয়ে নিজে ড্রাইভারের পাশের সীটে বসে গেলো। রাজু পিছনে ঢুকে আবিষ্কার করল সেখানে আরেকজন বসে আছে। মানুষটি সুদর্শন কিন্তু ঠিক কী কারণ জানা নেই সেই সুদর্শন মুখে একধরনের বিচিত্র কদর্যতা লুকিয়ে আছে। বয়স চল্লিশ কিংবা তার থেকে একটু বেশি। এক মাথা চুল এবং সেই চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে। মানুষটির চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ এবং তীব্র। রাজুর মনে হলো, গাড়ীর ভিতরে ঢুকতেই বিকট এবং পচা একটা গন্ধ ভক করে তার নাকে একটা ধাক্কা দেয়।

মানুষটি রাজুর দিকে নিজের হাতটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমার নাম কোরায়শী।"

রাজু অত্যন্ত অনিচ্ছার সাথে মানুষটির হাত স্পর্শ করলো। শীতল একটি হাত এবং হঠাৎ করে তার পুরো শরীরটা কেন জানি শিউরে ওঠে। সে শুকনো গলায় বলল, "আমার নাম রাজু।"

"আমি জানি। নীরা আমাকে বলেছে। নীরার কাছে আমি তোমার কথা শুনেছি। তুমি করে বলছি বলে কিছু মনে করলে না তো? তুমি আমার থেকে অনেক ছোট।"

প্রথম দেখাতেই কেউ যদি রাজুকে তুমি বলে সম্বোধন করে তাহলে রাজু খুব বিরক্ত হয় কিন্তু সেটা এখানে প্রকাশ করার সুযোগ নেই। সে ভদ্রতার ছোট একটা হাসি দিয়ে চুপ করে রইল।

কোরায়শী নামের মানুষটা সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, "নীরা। আমরা এখন কোথায় যাব?"

"শাহবাগে একটা ফাস্টফুডের দোকানে যেতে পারি। চা কফি কিছু খেলাম।"

"ঠিক আছে চল, তাহলে।"

ড্রাইভার গাড়ী ছেড়ে দেয়– রাজু দেখলো আজকে যে গাড়ী চালাচ্ছে সেই মানুষটির চোখেও কালো চশমা। সেই মানুষটিও কোনো কথা বলছে না।

কোরায়শী নীরার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি এতো ছোট বাচ্চাকে নিয়ে সামনে বসেছো? কার সীট ছাড়া! সীট বেল্ট ছাড়া? আমেরিকা হলে তুমি এতোক্ষণে ঝামেলায় পড়ে যেতে।"

নীরা বলল, "এটা আমেরিকা না। এখানে আমরা আরো অনেক বড় বড় কাজ করে ফেলি, কোনো ঝামেলা হয় না।"

"সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি।"

কোরায়শী তখন গুন গুন করে একট বিদেশী সুর তুলতে তুলতে সামনের সীটে ঝুলিয়ে রাখা ফ্লাক্সটি হাতে নেয়। ফ্লাক্সের মুখে লাগানো মগটি খুলে সেখানে ফ্লাক্স থেকে গরম কফি ঢেলে রাজুর দিকে এগিয়ে দেয়। বলে, "নাও। খাও। পিওর কলম্বিয়ান কফি। পৃথিবীর সেরা। তোমাদের ফাস্টফুডের দোকানের কফি খাওয়া যাবে কীনা আমি এতো শিওর না।"

রাজু বলল, "আমি খাব না। থ্যাংকস।"

"খাবে না?"

"না খেতে ইচ্ছে করছে না।"

"ঠিক আছে তাহলে একটা চুমক দাও। কফি বলতে কী বোঝানো হয় তুমি তাহলে তার একটা ধারণা পাবে। এখানে কফি বলে তোমরা যেটা খাও সেটা হচ্ছে পায়েশ।"

রাজু খুব অনিচ্ছার সাথে কফির মগটা হাতে নেয়। কোরায়শী তখন নিজের জন্যে এক মগ ঢেলে নিয়ে সেখানে চুমুক দিয়ে সামনে তাকিয়ে বলল, "নীরা। তোমার কোলে বাচ্চাটা রয়েছে তাই তোমাকে দিলাম না।"

"ঠিক আছে।"

কোরায়শী তার কফির মগে চুমুক দিয়ে পরিতৃপ্তির এক ধরনের শব্দ করে রাজুর দিকে তাকালো, বলল, "তুমি খাবে না।"

রাজুর গা ঘিনঘিন করছিলো কিন্তু তারপরেও সে কফির মগে একটা চুমুক দিলো। কলম্বিয়ান কফির সুঘ্রানের বদলে সে কেমন যেন একটা ওষুধের গন্ধ পেলো। কফির মগটা কোরায়শীকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "নাহ্! আমি খাব না। কেমন যেন–"

"কেমন যেন কী?"

"ওষুধের মতো গন্ধ।"

"তাই নাকি?" কোরায়শী রাজুর কফির মগটা নিজের হাতে নিয়ে বলল, "আমাকে বলেছিলো জিনিষটার কোনো গন্ধ নেই। কিন্তু তুমি গন্ধ পেলে?"

রাজু একটু অবাক হয়ে বলল, "কোন জিনিষটার গন্ধ নাই?"

"তুমি যেটা এক চুমুক খেয়েছ।"

রাজু হঠাৎ এক ধরনের আতংক অনুভব করে, "আমি কী খেয়েছি?"

"ঘুমের ওষুধ। তোমার কফিতে আমি যেটা মিশিয়ে দিয়েছি। হলুদ রংয়ের একটা পাউডারের মতোন। খুবই পটেন্ট। লোকাল নাম বেহুশ মশলা।"

রাজু ভয়ানক চমকে উঠে একবার কোরায়শীর দিকে আরেকবার নীরার দিকে তাকালো তারপর চিৎকার করে বলল, "তোমরা আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছ?"

"হ্যাঁ।" কোরায়শী নামের মানুষটা দাঁত বের করে হাসল, তার দাঁতগুলো হলুদ এবং যখন হাসে তখন অনেকখানি মাড়ি বের হয়ে আসে। মানুষটির চেহারার একটা নিষ্ঠুর ভাব ফুটে উঠেছে যেটা রাজু আগে লক্ষ করে নি।

রাজু বলল, "গাড়ী থামাও। আমি নেমে যাব।"

কোরায়শী বলল, "আমিও তোমার জায়গায় হলে তাই করতে চাইতাম। কিন্তু সেটা করা আর সম্ভব না।"

রাজু গাড়ীর হ্যান্ডেলটা ধরতে গিয়ে আবিষ্কার করল সেখানে কোনো হ্যান্ডেল নেই। কোরায়শী এবারে শব্দ করে হাসতে শুরু করে এবং হঠাৎ করে তাকে একটা হিংস্র পশুর মতো দেখাতে থাকে! সে হাসতে হাসতে বলল, "তোমাকে নিয়ে যাব বলে আজকে তোমার দরজার হ্যান্ডেলটা খুলে রেখেছি! শুধু শুধু উত্তেজিত হয়ো না রাজু। তোমার চোখে যে ঘুমটা নেমে আসছে, সেটা উপভোগ কর।"

রাজু হঠাৎ করে বুঝতে পারে তার শরীরটা অবশ হতে শুরু করেছে। সে নিজের ভেতরে একটা ভয়ংকর ধরনের আতংক অনুভব করে। সে চিৎকার করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করে কিন্তু কিছু বলতে পারে না।

কোরায়শী তার দিকে একটু এগিয়ে এসে বলল, "আজ অমাবস্যা। আজ রাতে আমাদের অনেক বড় অনুষ্ঠান রয়েছে। সেই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হচ্ছে লুসিফার! তুমি লুসিফারের নাম শুনেছ?"

রাজুর চেতনা ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাচ্ছিল তার মাঝে সে লুসিফার শব্দটি ধরতে পারলো। শয়তানের উপাসকরা ব্ল্যাক ম্যাজিক করার সময় শয়তানকে লুসিফার বলে সম্বোধন করে।

"পৃথিবীর খুব বেশি মানুষ লুসিফারকে আনতে পারে না! তার কারণ তাকে আনার জন্যে একটা খুব ভালো মিডিয়াম দরকার যার ওপরে লুসিফার ভর করতে পারবে। পৃথিবীতে সেরকম মানুষ খুব বেশি নাই– সারা পৃথিবীতে সব মিলিয়ে খুব বেশি হলে এক ডজন হবে। তুমি সেরকম একজন মানুষ। তুমি হচ্ছ আমাদের গোল্ডমাইন– তুমি হচ্ছ আমাদের সোনার খনি। তোমার উপর ভর করে লুসিফার আজকে আমাদের দেখা দিবে। আজকে আমাদের খুব আনন্দের দিন। সেই জন্য তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। রাজু তুমি শান্তিতে ঘুমিয়ে যাও। যখন সময় হবে আমরা তোমাকে জাগিয়ে তুলব।"

রাজু দেখতে পেলো কোরায়শী তার কদর্য মুখটা তার মুখের কাছে এনে হাসির মতো শব্দ করল। তার মুখ থেকে ভক করে এক ধরনের পচাগন্ধ রাজুর নাকে ধাক্কা দেয়। রাজু চিৎকার করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু সে আবিষ্কার করে সে তার শরীরের কোনো মাংশপেশী নাড়াতে পারছে না– তার চারপাশের সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে আসতে থাকে। কিছু বোঝার আগেই সে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

খুব ধীরে ধীরে রাজুর জ্ঞান ফিরে আসে। সে চোখ খুলে দেখতে পায় বিশাল একটা হলঘরের মাঝখানে উঁচু একটা বেদীতে সে শুয়ে আছে। তার শরীরে কালো একটা আলখাল্লা, আলখাল্লার বুকের ওপর সাদা দিয়ে বৃত্তাকার একটা নকশা। রাজু উঠে বসার চেষ্টা করে বুঝতে পারল তার হাত এবং পা দড়ি দিয়ে বেদীর সাথে বাধা। রাজু মাথা ঘুরিয়ে দেখতে পায় হলঘরের চারপাশে অনেক মানুষ, নারী এবং পুরুষ দুইই আছে। কারো চেহারা দেখা যাচ্ছে না কারণ সবার মুখেই একটা সাদা মুখোশ লাগানো। মুখোশটি ভয়ংকর, সেটাতে এক ধরনের হাসি লেপটে আছে, এই কৃত্রিম হাসিটি দেখে বুক কেঁপে উঠে। চারপাশে ঘিরে থাকা মানুষগুলো নানা ধরনের কাজকর্ম করছে। এক পাশে খাবারের আয়োজন, এক পাশে কিছু বাদ্যযন্ত্র। মাঝামাঝি মাটির মালশায় আগুন জ্বালানো হয়েছে সেখান থেকে ধূয়া বের হচ্ছে– ধূয়ার মাঝে এক ধরনের ঝাঁঝালো গন্ধ। রাজু অর্ধচেতনের মতো শুয়ে থাকে, কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে তার মনে হতে থাকে কোনো কিছুতেই বুঝি আর কিছু আসে যায় না। অবসন্ন শরীরে সে আবার অচেতন হয়ে যাচ্ছিল তখন মুখোশ পরা এবং কালো আলখাল্লায় ঢাকা একজন মানুষ একটা ছোট ব্যাগ নিয়ে তার কাছে এগিয়ে আসে। মানুষটি ব্যাগ থেকে ছোট একটা এ্যাম্পুল বের করে দক্ষ হাতে আঙুল দিয়ে টোকা দিয়ে সেটা ভেঙ্গে ফেলে, তারপর একটা সিরিঞ্জ বের করে সেখানে এ্যাম্পুলের তরলটুকু টেনে নেয়। রাজুর কাছে এসে এ্যালকোহলের ভেজা একটা তুলো দিয়ে তার হাতের মাংশপেশীটুকু পরিষ্কার করে তাকে ইনজেকশান দিতে উদ্যত হয়।

রাজু জিজ্ঞেস করল, "আমাকে কী ইনজেকশান দিচ্ছেন।"

মানুষটা রাজুর প্রশ্নটা পুরোপুরি উপেক্ষা করে দক্ষ হাতে পুট করে তার হাতে সুঁই ফুটিয়ে দেয়।

রাজু আবার জিজ্ঞেস করল, "কীসের ইনজেকশান এটা?"

মানুষটা ইনজেকশান দেয়া শেষ করে সিরিঞ্জটা টেনে বের করে বলল, "এটা যদি তোমার জানা প্রয়োজন হতো তাহলে আমি তোমাকে বলতাম।"

রাজু আবার জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কারা?"

মানুষটা তার ব্যাগের ভেতর ভাঙ্গা এ্যাম্পুল এবং সিরিঞ্জটা রেখে বলল, "এটাও যদি তোমার জানা প্রয়োজন হতো তাহলে আমি তোমাকে বলতাম।" কথাটা শেষ করে মানুষটা তার মাথাটা অল্প অল্প নাড়ালো, মুখোশের জন্যে তার

মুখমণ্ডল দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু রাজু অনুমান করলো সে নিঃশব্দে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

মানুষটি কয়েক পা এগিয়ে যাবার সাথে সাথে অন্যান্য মানুষের ভীড়ে হারিয়ে গেলো।

রাজু কয়েক মিনিটের মাঝেই বুঝতে পারে তাকে কী ধরনের ইনজেকশান দেয়া হয়েছে। এটা এক ধরনের উত্তেজক ওষুধ, কিছুক্ষণের মাঝেই তার অবসন্ন ভাব কেটে যায় সে তার সারা শরীরে এক ধরনের উষ্ণ অনুভূতি অনুভব করে। সে পুরোপুরি জেগে ওঠে, হঠাৎ করে তার গলা শুকিয়ে যায় এবং প্রবল পানির তৃষ্ণা অনুভব করে। সে কারো কাছে পানি চাইবে কী না বুঝতে পারছিল না, তার চারপাশে যারা ঘুরছে তাদেরকে মানুষ বলে মনে হয় না, মনে হয় এক ধরনের প্রেতাত্মার মিছিল, এদের কাছে পানি খেতে চাওয়ার কোনো অর্থ আছে বলে মনে হয় না।

রাজু নিঃশব্দে শুয়ে থাকে, সে তার বুকের ভেতর একই সাথে এক ধরনের আতংক এবং হতাশা অনুভব করে। চারপাশের মুখোশপরা মানুষ এবং তাদের ফিস ফিস করে কথা বলার শব্দ তার স্নায়ুর উপর এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করে। রাজু সহ্য করতে পারছিলো না তাই সে চোখ বন্ধ করে নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকে।

ঠিক এরকম সময় রাজু একটা শিশুর কান্না শুনতে পেলো, পরিচিত কণ্ঠের কান্না তাই সে চোখ খুলে তাকালো। দেখলো মুখোশ পরা একজন মহিলা তার বগলে একটা শিশুকে ধরে এগিয়ে আসছে। শিশুটি বাপ্পী এবং মহিলার বাচ্চাটিকে ধরে রাখার এই ভঙ্গিটি খুবই পরিচিত। সে মাথাটা একটু উঁচু করে ডাকলো, "নীরা?"

মুখোশ পরা মহিলাটি তার কথা শুনে মাথা ঘুরে তাকালো কিন্তু কোনো কথা বলল না। রাজুর কাছাকাছি এসে সে বাপ্পীকে মেঝেতে শুইয়ে দিলো, রাজু খুব কষ্ট করে মাথা ঘুরিয়ে দেখতে পেলো মেঝেতে একটা গোল বৃত্ত এবং তাকে ঘিরে কিছু বিচিত্র নকশা আঁকা হয়েছে। বাপ্পীকে বৃত্তের মাঝখানে চিৎ করে শুইয়ে দেয়া হয়েছে– তার শরীরে কোনো কাপড় নেই। শীতল মেঝেতে শরীর স্পর্শ করার সাথে সাথে সে আরো জোরে শব্দ করে কাঁদতে থাকে।

বাপ্পীকে শুইয়ে নীরা উঠে দাঁড়ালো, তখন রাজু আবার ডাকলো, বলল, "নীরা! আপনি তো নীরা– এদিকে একটু শুনবেন! প্লীজ।"

মুখোশ পরা মহিলাটি তখন তার দিকে এগিয়ে আসে, কাছে এসে দাঁড়ায়।

রাজু জিজ্ঞেস করল, "এখানে কী হচ্ছে?"

নীরা নিচু গলায় বলল, "সময় হলেই জানবে।"

"বাপ্পীকে মেঝেতে শুইয়েছেন কেন?"

"নিয়ম। আমাদের নিয়ম।"

"কীসের নিয়ম?"

"যাকে স্যাক্রিফাইস করা হয় তাকে লুসিফারের সামনে রাখতে হয়।"

রাজু চমকে উঠে বলল, "যাকে কী করা হয়?"

"যাকে স্যাক্রিফাইস করা হয়।"

"স্যাক্রিফাইস?"

মুখোশ পরা নীরা মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। স্যাক্রিফাইস। মানে বলি।"

রাজুর কিছুক্ষণ লাগলো বুঝতে তারপর সে কাঁপা গলায় বলল, "বাপ্পীকে বলি দেবেন? বলি?"

"হ্যাঁ।"

"কে বলি দেবে?"

নীরা হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠলো, বলল, "তুমি! তোমার উপর লুসিফার ভর করবে। তখন তুমি বলি দেবে!"

রাজু রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখে কিছুক্ষণ মুখোশটার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর শুকনো গলায় বলল, "বাপ্পী আপনার ছেলে না?"

নীরা মাথা নাড়লো।

রাজু জিজ্ঞেস করল, "তাহলে?"

"তাহলে কী?"

যে মানুষ তাহলে কী সেটা জানে না তাকে কী জিজ্ঞেস করা যায়, রাজু বুঝতে পারল না। সে হতবাক হয়ে মুখোশটার দিকে তাকিয়ে রইলো, মুখোশের আড়ালে চোখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল কিন্তু কোনো লাভ হলো না।

এরকম সময় দ্রিম দ্রিম করে এক ধরনের ঢাকের শব্দ শোনা গেলো। রাজু তাকিয়ে দেখলো ঘরের এক কোণায় কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাদ্যযন্ত্রগুলো বাজাতে শুরু করেছে। হলঘরের সবগুলো মানুষ তখন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং একজন আরেকজনের হাত ধরে ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাতে থাকে।

ধীরে ধীরে বাজনার লয় বেড়ে ওঠে এবং মানুষগুলো আরো দ্রুত তাদের মাথা ঝাঁকাতে থাকে। রাজু দেখলো সবগুলো মানুষ একজন আরেকজনের হাত ধরে দাঁড়িয়েছে এবং তালে তালে মাথা নাড়ছে।

এরকম সময় ঘরের মাঝখানে মাটির মালশায় দপ করে বিশাল একটা আগুনের শিখা জ্বলে উঠল, এবং সারা ঘরে কর্পূরের ঝাঁঝালো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। রাজু দেখলো টকটকে লাল রংয়ের একটা আলখাল্লা পরা একজন মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি এসে সে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে যায়। মুঠি থেকে সে কিছু একটা আগুনের উপর ছেড়ে দিলো। সাথে সাথে আগুনের শিখাটা আবার দপ করে অনেক বড় হয়ে জ্বলে উঠলো।

লাল আলখাল্লা পরা মানুষটা রাজুর কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো, তারপর বেদীর নিচে থেকে একটা উঁচু টুপি বের করে মাথায় পরে নিয়ে দুই হাত উপরে তুলে বলল, "লুসিফার। লুসিফার।"

গোল হয়ে ঘিরে থাকা মানুষগুলো সমস্বরে বলল, "লুসিফার। লুসিফার।"

লাল আলখাল্লা পরা মানুষটি বলল, "আয় আয় আয়রে।"

অন্য সবাই বলল, "আয় আয় আয়রে।"

তখন সবাই সমস্বরে বলতে থাকে "লুসিফার! আয় রে! লুসিফার! আয় রে! লুসিফার! আয় রে!"

তালে তালে কথাগুলো বলতে বলতে সবাই গোল হয়ে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে তারা মাথা ঝাঁকাতে থাকে এবং হঠাৎ হঠাৎ হাত খুলে বুকে থাবা দিতে থাকে।

সারা ঘরে একটা গমগমে শব্দ হতে থাকে এবং এই শব্দ শুনে হঠাৎ করে রাজুর মাথা কেমন যেন গুলিয়ে যায়। তার মনে হতে থাকে সে বুঝি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। রাজুর বড় বড় নিঃশ্বাস বের হতে থাকে এবং সারা শরীর কাঁপতে থাকে। রাজু বুঝতে পারে সে কুল কুল করে ঘামছে। রাজুর চোখের সামনে হঠাৎ করে একটা মূর্তির চেহারা ভেসে উঠে– মূর্তিটির দীর্ঘ দেহ, মাথাটি মানুষের নয়, মাথাটি একটি পশুর। সেই পশুটি স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের সাথে তাল রেখে এই পশুটি অল্প অল্প দুলছে এবং হঠাৎ করে সেটি মুখ হা করছে। রাজু পশুটির ধারালো দাঁত এবং লকলকে লাল একটা জিব দেখতে পেলো।

রাজুর শরীর থেকে যেন আগুন বের হতে থাকে, সে ছটফট করে যন্ত্রণার কাতর শব্দ করে, তার সারামুখ ঘামে ভিজে যায় এবং মুখের চেহারায় এক ধরনের পাশবিক ভাব ফুটে উঠে।

লাল আলখাল্লা পরা মানুষটি রাজুর সামনে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ে বলল, "লুসিফার! প্রভু! আপনি কী এসেছেন?"

রাজু গলার স্বরটি চিনতে পারে, কোরায়শীর গলার স্বর। সে কোনো কথা না বলে এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে কোরায়শীর মুখোশ পরা মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কোরায়শী আবার জিজ্ঞেস করল, "প্রভু আপনি কী এসেছেন?"

রাজু অবাক হয়ে শুনলো তার গলা থেকে কেউ একজন বলল, "এসেছি!"

সাথে সাথে সারা ঘরে এক ধরনের আনন্দধ্বনী ছড়িয়ে পড়ে। কোরায়শী মাথা তুলে এগিয়ে আসে, কোমর থেকে একটা ধারালো ছোরা বের করে সে রাজুর হাত পায়ের বাঁধন কেটে দেয়।

রাজু তখন খুব ধীরে ধীরে বেদীতে উঠে বসলো, সে আচ্ছন্নের মতো চারদিকে তাকালো, চারপাশের মানুষগুলোকে সে এখন আর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না, মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে সমুদ্রের গর্জনের মতো মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। কেউ একজন তাকে ডাকছে। রাজুর মনে হলো সে আসলে রাজু নয়, সে অন্য কিছু। তার মনে হলো তার ভেতরে বিশাল একটা অন্ধকার জগৎ উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। সে অনুভব করতে পারে তার ভেতরে ভয়ংকর একটা পৈশাচিক শক্তি উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার জগতের সেই ভয়ংকর শক্তি দিয়ে ইচ্ছা করলেই সে সারা পৃথিবীকে গ্রাস করে ফেলবে।

রাজু টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো, সাথে সাথে তাকে ঘিরে থাকা সব মানুষ, মাথা নিচু করে নতজানু হয়ে বসে যায়। সে শুনতে পায় সারা ঘরে ফিস ফিস করে শব্দ হচ্ছে "লুসিফার! লুসিফার! লুসি লুসি লুসিফার!"

রাজু তার চারিদিকে তাকালো। সে হঠাৎ করে টের পেয়েছে তার ভেতরে এখন অকল্পনীয় একটা শক্তি। ইচ্ছে করলে সে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। সে আগুনের দিকে একটা আঙুল দিয়ে নির্দেশ দিতেই দপ করে আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। দূরে নতজানু হয়ে থাকা একজন সাবধানে তার মাথাটি উঁচু করে তার দিকে তাকিয়েছে, হঠাৎ করে রাজু নিজের ভেতরে এক ধরনের ক্রোধ

অনুভব করে। সে হাতটি সেই মানুষের দিকে উদ্যত করতেই মানুষটি ছিটকে উপরে উঠে যায়, তারপর প্রচণ্ড বেগে পিছনের দেওয়ালে আঘাত খেয়ে নিচে আছড়ে পারে।

হলঘরের সব মানুষের ভেতর এক ধরনের আতংক ছড়িয়ে পড়ে, রাজু সেই আতংকটি অনুভব করতে পারে, স্পর্শ করতে পারে, উপভোগ করতে পারে।

কোরায়শী তখন দুই হাতে বাপ্পীকে তুলে ধরে তার দিকে এগিয়ে ধরে। কাঁপা গলায় বলে, "প্রভু লুসিফার! আপনার প্রতি আমাদের আনুগত্যের নিদর্শন এই আবোধ প্রাণী। এর প্রাণটি আমরা আপনার চরণ তলে নিবেদন করছি। গ্রহণ করুন প্রভু। প্রভু লুসিফার। তার তুচ্ছ প্রাণ আপনি গ্রহণ করুন।"

রাজু নিজের ভেতরে এক ধরনের তৃষ্ণা অনুভব করে। সে জানে এই শিশুটি হাতে নিয়ে চুমক দিলেই তার তৃষ্ণার নিবারণ হবে, শিশুটির প্রাণটুকু তার শুষ্ক বুকের জ্বালাটুকু নিভিয়ে দেবে। রাজুর মুখে ভয়ংকর এক ধরনের হাসি ফুটে উঠে। সে লোলুপ দৃষ্টিতে শিশুটির দিকে তাকায়। সে টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে একটা হাত এগিয়ে দেয়। কোরায়শী বাপ্পীকে নিয়ে আরেকটু এগিয়ে আসে, মাথা নিচু করে তাকে রাজুর দিকে এগিয়ে দেয়।

রাজু বাপ্পীর দুই পা খপ করে ধরতেই তীব্র উত্তাপে বাপ্পীর পায়ের চামড়া পুড়ে যায়, একটা পোড়া গন্ধ হলঘরে ছড়িয়ে পড়লো। বাপ্পী প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদতে থাকে, দুই হাত ছুঁড়তে থাকে, মাথা ঝাঁকাতে থাকে।

রাজুর ভেতরে একটা অদম্য ক্রোধ এসে ভর করে, ইচ্ছে করে শুধু এই শিশুটি নয় চারপাশের সবকিছুকে ভস্মীভূত করে দিতে। অনেক কষ্ট করে সে নিজেকে শান্ত করল, শান্ত করে সে শিশুটির দিকে তাকালো, তার চোখের দৃষ্টিতেই শিশুটির শরীরে ফোসকা পড়ে যাচ্ছে– প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে চিৎকার করে যাচ্ছে।

কোরায়শী মাথা নিচু করে নতজানু হয়ে বসে বলছে, "গ্রহণ করুন প্রভু। গ্রহণ করুন। গ্রহণ করুন এর আত্মা। আপনার পদতলে আমরা নিবেদন করছি এই অবোধ প্রাণীটির আত্মা।"

রাজুর বুকের ভেতর ভয়ংকর তৃষ্ণা, এক চুমুক দিয়ে সে এখন এই শিশুটির আত্মা শুষে নেবে। তার মুখ হা হয়ে জিব বের হয়ে আসে, সমস্ত চেহারায় একটা লোলুপ দৃষ্টি ফুটে উঠে– ঠিক তখন তার ভেতর থেকে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে কে যেন বলল, "না-না-না-না-না..."

রাজু বাপ্পীকে উল্টো করে ধরে তার চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় শিশুটি দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে, চিৎকার করে কাঁদছে। রাজু তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, বুকের ভেতর ভয়ংকর তৃষ্ণা, এক চুমুক দিয়ে তার আত্মাটুকু শুষে নিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতে চাইছে কিন্তু কে যেন বহুদূর থেকে বলছে, "না-না-না-না..."

রাজু নিঃশব্দের কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তার ভেতরের অন্ধকার জগতের শক্তিটুকু ধীরে ধীরে উবে যাচ্ছে, বুঝতে পারছে ভেতর থেকে আর কেউ জেগে উঠছে, ভয়ংকর একটা টানাপোড়নে তার সমস্ত স্বত্তা যেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

রাজু হাঁটু ভেঙ্গে নিচে পড়ে যায়। তার হাত থেকে বাপ্পী খসে পড়ে, নিচে মেঝেতে আছড়ে পড়ে। রাজুর মাথার মাঝে প্রচণ্ড যন্ত্রণা, সে দুই হাতে মাথা খামচে ধরে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

হলঘরের ভেতর দ্রিম দ্রিম করে যে বাজনা বাজছিলো সেটি হঠাৎ করে থেমে গেলো, লুসিফার লুসিফার করে যে ধ্বনি উঠছিলো সেটাও থেমে গেছে। পুরো হলঘরে একটা বিস্ময়কর নৈঃশব্দ। শুধু বাপ্পীর তারস্বরে চিৎকার সেই নৈঃশব্দকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে।

কোরায়শী সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুখ থেকে তার মুখোশ খুলে ফেললো, দুই পা এগিয়ে এসে রাজুর দিকে তাকালো। রাজু অচেতন হয়ে পড়ে আছে। তার নাক দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে।

মুখোশপরা মানুষগুলি হেঁটে হেঁটে কোরায়শীর পাশে দাঁড়াতে থাকে। একজন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে লীডার। প্রভু লুসিফার স্যাক্রিফাইস নিল না কেন? আমরা কী কোনো ভুল করেছি?"

"না।"

"তাহলে?"

এই ছেলেটা ভেতর থেকে জেগে উঠেছে। প্রভু লুসিফারকে সরিয়ে দিয়েছে।

"কী বলছেন লীডার?"

"হ্যাঁ। এই ছেলেটা করতে দেয় নাই।"

"হারামীর বাচ্চা।"

"হ্যাঁ হারামীর বাচ্চা।"

মানুষটা একটু ঝুঁকে পড়ে রাজুকে দেখে বলল, "মরে গেছে নাকী?"

"জানি না।" কোরায়শী বলল, "এখন যদি নাও মরে থাকে পরে মরে যাবে। বাঁচবে না। প্রভু লুসিফার তাকে বাঁচতে দেবে না। তার স্যাক্রিফাইস নিতে দেয় নাই– কতো বড় সাহস দেখেছ?"

নীরা এসে বাপ্পীকে তুলে নেয়, শরীরের এখানে সেখানে ফোসকা, পায়ের যেখানে ধরেছিলো সেখানে চামড়া পুড়ে গিয়ে দগদগে ঘা। কোরায়শী ক্লান্ত চোখে বাপ্পীকে দেখে বলল, "নীরা।"

"বলেন।"

"লুসিফার তোমার বাচ্চাকে নিজের হাতে স্পর্শ করেছেন।"

"কিন্তু আমাদের স্যাক্রিফাইস গ্রহণ করেন নি।"

"গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, এই হতভাগার জন্যে পারেন নি।" কোরায়শী পা দিয়ে রাজুর অচেতন দেহে একটা লাথি দিলো।

নীরা জিজ্ঞাস করল, "এখন কী হবে লীডার?"

"তোমার এই বাচ্চাটার শরীরে লুসিফারের স্পর্শ রয়েছে। আগে হোক পরে হোক একদিন তার মাঝে লুসিফার দেখা দেবেন। তোমার এই বাচ্চাটি এখন সাধারণ কোনো বাচ্চা নয়। সে এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বাচ্চা। সারা পৃথিবীর সম্পদ। নূতন পৃথিবীর নূতন লুসিফার।"

নীরা বাপ্পীকে শান্ত করার চেষ্টা করতে করতে বলল, "কখন তার শরীরে লুসিফারের আশীর্বাদ দেখব।"

"বড় হলে। কতো বড় হলে জানি না। যখন বুঝতে শিখবে তখন। তাকে খুব দেখে শুনে রাখতে হবে। পারবে না?"

"পারব।"

"আমরাও তোমাকে সাহায্য করব।"

"থ্যাংকস লীডার।"

কোরায়শী তখন সবার দিকে তাকালো, তারপর গলা উঁচিয়ে বলল, "আমাদের আজকের কোভেন্ট এখানেই শেষ। একজন একজন করে চলে যাবেন, এক সাথে সবাই বের হবেন না, সন্দেহ করতে পারে।"

একজন মেঝেতে পড়ে থাকা রাজুকে দেখিয়ে বলল, "আর এই ছেলেটার কী হবে?"

"বাইরে নিয়ে কোথাও ফেলে দিতে হবে। কেউ একজন গাড়ীর ট্রাংকে করে নিয়ে যাও। রাস্তার পাশে ফেলে দিও।"

"বেঁচে আছে কী?"

"জানি না। যদি বেঁচে থাকেও– বেশীক্ষণ টিকবে না। লুসিফার যার শরীরে ভর করে সে কখনো বেঁচে থাকে না।"

কিন্তু রাজু বেঁচে রইলো। রাস্তার পাশে থেকে যখন তার দেহ উদ্ধার করেছে তখন সে বেঁচে আছে না মারা গেছে ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল না। নাম ঠিকানাহীন অপরিচিত একজন মানুষ তাকে বাঁচানোর জন্যে হাসপাতালের ডাক্তাররাও খুব ব্যস্ত ছিলো না। তিনদিন অচেতন থেকে সে জ্ঞান ফিরে পেলো। তখন তার মুখ থেকে খবর পেয়ে তার বন্ধু বান্ধবরা তাকে দেখতে এলো।

তার ঠিক কী হয়েছিলো সেটা কাউকেই পরিষ্কার করে বোঝানো যায় নি তাই সে তার চেষ্টা করল না। তাকে কিছু মানুষ ধরে নিয়ে গিয়েছিলো– এরপরে কী হয়েছে সে জানে না, এর বাইরে সে আর কিছু বলল না। পরিচিত বন্ধু বান্ধবেরা চলে যাবার পরও চৈতী রয়ে গেলো এবং তার মাথার কাছে একটা টুলের উপর চুপ করে বসে রইল।

রাজু জিজ্ঞেস করল, "তুই বাসায় যাবি না?"

"যাব।"

"যা। দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমাকে নিয়ে চিন্তা করিস না, আমি ঠিক হয়ে যাব।"

চৈতী কোনো কথা বলল না। রাজু তখন তার দুর্বল হাত বাড়িয়ে চৈতীর হাত স্পর্শ করল এবং হঠাৎ করে সে একটা দৃশ্য দেখতে পেলো। সুদর্শন একজন মানুষের বুকের কাছে ঢলে পড়ে চৈতী খিল খিল করে হাসছে। রাজু চমকে উঠে চৈতীর মুখের দিকে তাকালো। চৈতী জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে?"

রাজু কোনো কথা না বলে চৈতীর হাতটা আরেকটু জোরে চেপে ধরে তখন আবার সে একটা দৃশ্য দেখতে পায়। হাত ধরাধরি করে চৈতী আর সুদর্শন মানষটি ভীড়ের মাঝে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। দূরে কোথা থেকে একটা প্লেনের গর্জন শোনা যাচ্ছে।

রাজু ফ্যালফ্যাল করে চৈতীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চৈতী আবার জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

রাজু মাথা নাড়ল, বলল, "না। কিছু হয় নি।"

চৈতী একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে রাজুর দিকে তাকিয়ে বলল, "রাজু তোকে একটা কথা কয়েকদিন থেকে বলব বলে ভাবছিলাম।"

রাজু বলল, "আমি জানি।"

"কী জানিস?"

"তুই কী বলতে চাইছিস।"

চৈতী বলল, "আমি কী বলতে চাইছি?"

"তুই বিদেশ চলে যাচ্ছিস।"

চৈতী অবাক হয়ে বলল, "তুই কেমন করে জানিস?"

রাজু তখন চোখ বন্ধ করে বলল, "আমি জানি বিদেশ থেকে একটা ছেলে এসেছে তাকে বিয়ে করে তুই চলে যাচ্ছিস।" রাজুর ইচ্ছে করল সে ডুকরে কেঁদে উঠে বলে, প্লীজ চৈতী! তুই যাস নে। আমাকে ছেড়ে তুই চলে যাস নে। কিন্তু সে কোনো কথা বলল না।

চৈতী বলল, "বুঝলি রাজু। যাই হোক তুই আমাকে আবার না কোনো ভাবে ভুল বুঝিস। তুই আর আমি ছিলাম খুব ভালো বন্ধু। ঠিক কী না?"

রাজু ফিসফিস করে বলল, "হ্যাঁ। ঠিক।"

"তার বেশি কিছু নয়। ঠিক কী না?"

রাজু কোনো কথা বলল না। চৈতী সেটা না দেখার ভান করে বলল, "জীবনটা খুব কঠিন। সেখানে সিদ্ধান্তগুলো নিতে হয় অনেক চিন্তা ভাবনা করে।"

রাজু ফিস ফিস করে বলতে চাইলো, না। সব সিদ্ধান্ত চিন্তা ভাবনা করে নিতে হয় না। অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয় এমনি এমনি। মন চায় সে জন্যে। জগৎ সংসারের উল্টো দিকে, পাগলের মতো।"

"ছেলেটি ভালো। এ্যস্টাব্লিসড। ভেরি স্মার্ট।"

রাজুর হঠাৎ অভিমানে চোখে পানি এসে যেতে চায় কিন্তু সে জোর করে মুখে একটা শান্ত ভাব ধরে রাখল।

"তার ইউনিভার্সিটিতে আমি ক্রেডিট ট্রান্সফার করে নিতে পারব।"

রাজু অনেক কষ্ট করে মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বলল, "কংগ্রাচুলেসন্স চৈতী।"

রাজুর গলার স্বরে কিছু একটা ছিলো যেটা শুনে চৈতী একটু অবাক হয়ে রাজার দিকে তাকালো, তারপর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "রাজু। জীবনা কিন্তু আসলে নাটক না। সত্যিকারের জীবনে অনেক কিছু থাকে-"

"আমি কিচু বলিনি চৈতী। আমি চলেছি কংগ্রাচুলেসন্স"

"কিন্তু তুই সেটা বোঝাস নি। তুই অন্য কিছু বুঝেয়েছিস" চৈতী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তুই কী ভাবছিস আমি জানি না। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছি। তোর ভালোর জন্যে এবং আমার ভালোর জন্যে"

রাজু মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ! নিয়েছিল! আমি জানি।"

চৈতি হঠাৎ কেমন জেনো রেগে উঠে, "তুই তোর যা ইচ্ছে হয় তুই ভাবতে পারিস। কিন্তু জেনে রাখ জীবনটা ছেলেখেলা না।"

রাজু কিছুক্ষণ চৈতীর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর হাত বাড়িয়ে চৈতীর হাত স্পর্শ করে বলল, "গুড লাক চৈতী। তোকে শুধু একটা কথা বলি। তোর য কখনো আমার দরকার হয় বলিস। আমি-আমি-।"

"তুই কী?"

"তার জন্যে অপেক্ষা করব।"

চৈতী কোনো কথা না বলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বলল, "আমি গেলাম। তোর সাথে আবার দেখা হবে।"

"না চৈতি, আর দেখা হবে না। ভারো থাকিস।"

চৈতী চলে গেলে রাজু সাবধানের তার চোখের কোন মুছে নেয়। যে কথাটি সে চৈতীকে বলতে পারেনি সেটি হচ্ছে সুদর্শন যে মানুষটিকে চৈতী বেছে নিয়েছে সেই মানুষটি ভালো নয়। মানুষটি সুদর্শন, প্রতিষ্ঠিত এবং স্মার্ট। কিন্তু মানুষটি গলো মানুষ নয়। তার বুকের ভেতর রয়েছে গভীর এক ধরনের অন্ধকার।

যেদিন হাসপাতাল থেকে সে ছাড়া পাবে সেদিন বিকল বেলা লালচে চুলের গলো চশমা পরা একজন মহিলা তার সাথে দেখা করতে এলো। মহিলাটি চশমা খলার পর সে তাকে চিনতে পারলে, চুলের রং পাল্টে ফেলেছে বরে হঠাৎকরে রতে পারে নি-মহিলাটি নীরা।

াজু অবিশ্বাসের দুষ্টিতে নীরার দিকে তাকিয়ে থাকে। নীরা মুখে একটা হাসি টিয়ে বলল, "কী খবর?"

রাজু অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত রাখে। দাঁতে দাঁত চেপে শীতল গলায় বলল, "তুমি সত্যিই জানতে চাইছ আমার কী খবর?"

নীরা একটু হাসার ভঙ্গী করে বলল, "আগে তুমি আমাকে আপনি করে সম্বোধন করেছ– আমার বয়স তোমার থেকে বেশি।"

রাজু বলল, "তোমার সাহস দেখে আমার মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে।"

"তাহলে আমি বেশিক্ষণ বসব না। আমি আসলে তোমাকে একটা খবর দিতে এসেছি।"

"কী খবর?"

"আমরা আমেরিকা চলে যাচ্ছি। এই দেশে আমাদের সব কাজকর্ম বন্ধ করে দিচ্ছি। তোমার আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না–"

রাজু বলল, "আমার পুলিশকে ডাকা উচিৎ ছিলো।"

নীরা মিষ্টি করে হাসলো, বলল, "তুমি ডাকো নি সেটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। তুমি কিছুই প্রমাণ করতে পারতে না। তা ছাড়া–"

"তা ছাড়া কী?"

"আমাদের সাথে যারা আছে তারা এতো ক্ষমতাবান যে কেউ তাদেরকে স্পর্শ করতে পারতো না। যদি কেউ চেষ্টা করে সে উল্টো বিপদে পড়ে যাবে।"

রাজু তীব্র চোখে নীরার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোদিন বিশ্বাস করতাম না যে একজন মা হয়ে নিজের বাচ্চাকে মেরে ফেলার জন্যে দিয়ে দিতে পারে।"

নীরা ভুরু কুঁচকে রাজুর দিকে তাকালো, বলল, "রাজু। তুমি খুব চালাক চতুর মানুষ, কিন্তু তোমার নলেজে খানিকটা ঘাটতি আছে।"

"ঘাটতি?"

"হ্যাঁ। তুমি ভাবো পৃথিবীর সব মানুষ তোমার মতোন। নরম এবং আবেগ দিয়ে ঠাসা! এটা সত্যি না। পৃথিবীতে দুই থেকে তিন পারসেন্ট মানুষের ভেতরে কোনো ইমোশান নাই, ভালো বা মন্দের অনুভূতি নাই। তারা দরকার হলে নিজের মা'কে বিক্রি করে দেয় কিংবা ছেলেকে খুন করে ফেলে। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য।"

"আমি বিশ্বাস করি না।"

"বিশ্বাস করা না করা তোমার ব্যাপার কিন্তু এটা সত্যি। আমরা হচ্ছি সেই দুই থেকে তিন পার্সেন্ট মানুষ! আমাদের ভেতরে ভালো মন্দের বোধ নেই। অনুভূতি নেই। আমাদের ভেতর কোনো কিছুর জন্যে বিন্দুমাত্র ভালোবাসা নেই।"

"আমি বিশ্বাস করি না। এটা হতে পারে না।"

নীরা উঠে দাঁড়ালো, বলল, "এটা হতে পারে। আমরা হচ্ছি তার উদাহরণ। পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের মতো মানুষ অনেক আছে। বুঝলে রাজু– তোমাকে একটা উপদেশ দিয়ে যাই।"

"কী উপদেশ?"

"আমাদেরকে কখনো বিশ্বাস করো না।"

নীরা চলে যাবার পর রাজুর অনেকক্ষণ লেগেছিল স্বাভাবিক হতে।

এর ঠিক এক সপ্তাহ পরে চৈতী এবং নীরা একই প্লেনে দেশ ছেড়ে চলে গেলো। তারা দুজন দুজনকে চিনতো না, কখনোই একজনের সাথে আরেকজনের দেখা হয় নি। ভবিষ্যতেও কখনো দেখা হবে না।

কিন্তু এই দুজনেই ছয় বছর পরে একই প্লেনে ফিরে এসেছিল একই মানুষের খোঁজে।

দ্বিতীয় পর্ব

ওরিওন চিলড্রেন্স হোম আসলে অসহায় শিশুদের কোনো আবাসস্থল নয়, বিত্তশালী মানুষেরা যখন তাদের সন্তান পালনের দায়িত্বটি নিজেরা নিতে চায় না তখন তারা তাদের বাচ্চাদের এখানে রেখে যায়। এখানে বাচ্চাদের মানুষ করতে বছরে অনেকগুলো ডলার গুনতে হয় কিন্তু তারপরেও এই হোমে ছোট বাচ্চাদের কোনো অভাব নেই। বেশিরভাগ বাচ্চাদের বাবা মায়ের মাঝে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। কিছু আছে বাবাহীন মায়ের সন্তান– বেশিরভাগই অবিবাহিতা। এক দুইজন আছে যাদের বাবা মা নেই কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে প্রচুর টাকা পয়সা আছে।

ওরিওন চিলড্রেন্স হোমের কর্মকর্তারা খুব আন্তরিক ভাবে বাচ্চাদের মানুষ করার চেষ্টা করে কিন্তু তার পরেও বাচ্চাগুলোর মনের জগতে একটা বিরাট অংশ ফাঁকা থেকে যায়। এই হোমের পরিচালক মিসেস থুলের মাঝে মাঝে মনে হয় দরিদ্র ভাঙ্গাচোরা একটা পরিবারও বুঝি সব ধরণের সুযোগ সুবিধে সহ গড়ে তোলা এই আধুনিক চিলড্রেন্স হোম থেকে ভালো।

মিসেস থুল খুব চেষ্টা করেন যেন বাচ্চাগুলোর মাঝে একটা পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। কিন্তু কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে সেটা গড়ে উঠতে চায় না। প্রায় সময়েই দেখা যায় নিজেদের ভেতরে এক ধরনের অবিশ্বাস, সন্দেহ দানা বেধে উঠতে থাকে। মিসেস থুল মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে চান যে একটা শিশুকে যেভাবে গড়ে তোলা হবে সে ঠিক সেভাবেই গড়ে উঠবে কিন্তু তারপরেও তিনি এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে আবিষ্কার করেছেন কোনো কোনো শিশু সব রকম ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে সম্পূর্ণ বিচিত্র একটি উপায়ে পুরোপুরি নিজের মতো করে বড় হতে থাকে।

মিসেস থুল কিছু কিছু শিশুকে বুঝতেও পারেন না। সেরকম একটা শিশু হচ্ছে বাপ্পী– তার বয়স ছয় এবং সে একজন স্বামীহীন মায়ের সন্তান। মিসেস থুল প্রথমে ভেবেছিলেন শিশুটি ভারতবর্ষের। পরে জানতে পেরেছেন জন্মসূত্রে বাচ্চাটি বাংলাদেশের। মায়ের নাম নীরা এবং মা বাচ্চাটিকে এখানে রেখে দিয়ে মোটামুটি ভাবে তাকে ভুলে গেছে। মা-বাবাদের রুটিন মাফিক তাদের বাচ্চাদের দেখতে আসার যে নিয়মগুলো আছে এর মা সেটিও পালন করে না। কালে ভদ্রে তাকে দেখতে আসে এবং এভাবে দেখতে দেখতে বাচ্চাটির ছয় বছর বয়স হয়ে গিয়েছে।

মিসেস থুলের জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী বাপ্পী নামের এই বাচ্চাটির তার মায়ের সাথে কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা নয়। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি ছয় বছরের এই ছোট বাচ্চাটি বেশির ভাগ সময় কাটায় তার মায়ের কথা কল্পনা করে। তার মা তাকে আসলে খুব ভালোবাসে এবং একদিন তাকে এখান থেকে খুব সুন্দর একটা বাসায় নিয়ে যাবে সেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা সে মায়ের কোল ঘেঁষে বসে থাকবে এবং মা তাকে রূপকথার গল্প পড়ে শোনাবে এই ধরনের একটা বিষয় সে শুধু কল্পনা করে না, রীতিমতো বিশ্বাস করে। মিসেস থুল বাপ্পী নামের ছয় বছরের এই ছেলেটির মায়ের সাথে কথা বলে দেখেছেন, সেই মায়ের মনে এই শিশুটির জন্যে সন্তানসুলভ কোনো মায়া নেই। মিসেস থুল কথায় বার্তায় মাঝে মাঝে বাপ্পীর মা নীরাকে এ ব্যাপারে একটু ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, নীরা হয় সেই ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে নি কিংবা ইঙ্গিতটাকে বিবেচনাতেই আনে নি।

মিসেস থুল বাপ্পী নামের এই ছেলেটিকে কখনেই ভালো করে বুঝতে পারেন নি। বেশির ভাগ সময়েই তার মনে হয় বাচ্চাটি বুঝি খুব শান্তশিষ্ট কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ তার মাঝে মুহূর্তের জন্যে এক ধরনের ভয়ংকর ক্রোধ উঁকি দিয়ে যায়– সেটা সত্যি ক্রোধ না অন্যকিছু সেটাও তিনি বুঝতে পারেন না। প্রথম প্রথম তার মনে হতো বাচ্চাটি খুব মৃদু ভাবে অটিস্টিক, কিন্তু শেষে দেখা গেছে সেটা সত্যি নয়– তার অটিজম নেই, কিন্তু জগৎ সংসারের অনেক কিছুর প্রতিই তার এক ধরনের নিস্পৃহ ভাব আছে।

বাপ্পীর মতো বাচ্চাকে ঠিক করে বুঝতে পারেন না বলে মিসেস থুলের নিজের ভেতরে যেরকম এক ধরনের অস্বস্তি কাজ করে ঠিক সেরকম কেভিনের মতো ছেলেদের একেবারে পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারেন বলেও তার নিজের ভেতরে

এক ধরনের অস্বস্তি কাজ করে। কেভিন একটা ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়া মা বাবার ছেলে। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর মা ছাড়াছাড়া ভাবে এক দুইবার কোনো বয়ফ্রেন্ডের সাথে দিন কাটাতে চেষ্টা করেছে, কোনোবারই সেটা কাজ করে নি। বিষয়টাকে সহজ করার জন্যে কেভিনকে ওরিওন চিলড্রেন্স হোমে নিয়ে রেখেছে, বাচ্চাটি সেজন্যে তার মা'কে কোনোদিন ক্ষমা করে নি। কেভিনের বয়স দশ কিন্তু তার বাড়ন্ত শরীর দেখে মনে হয় বয়স বারো কিংবা তেরো! শক্তিশালী দেহ এবং এই বয়সেই তার নিষ্ঠুর একটা মুখ। ওরিওন চিলড্রেন্স হোমের বাচ্চাদের কাছে সে একটা মূর্তিমান বিভীষিকার মতো– তাদেরকে সে ভয়ংকর ভাবে উত্যক্ত করে, যন্ত্রণা দেয়, অত্যাচার করে। মিসেস থুল আর হোমের মানুষজনকে সব সময়েই সতর্ক থাকতে হয় কখন এই ছেলেটি কমবয়সী অন্য আরেকটি ছেলে বা মেয়ের উপরে চড়াও হয়। কেভিন ছেলেটির চরিত্রটি মিসেস থুল খুব পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারেন কারণ তার মাঝে কোনো জটিলতা নেই। কেভিনের ভেতরে রয়েছে জগৎ সংসারের প্রতি এক ভয়ংকর ক্রোধ, সে নিজে তার বাবা মা থেকে মোটামুটি ভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে। ধরেই নিয়েছে এই নিষ্ঠুরতাই হচ্ছে জীবনের ধরন, সে নিজেও সেটা পাবে অন্যকেও সেটা দেবে। এখান থেকে তাকে নিবৃত্ত করার উপায় মাত্র একটি– সেটা হচ্ছে আরো কোনো বড় নিষ্ঠুরতার আতংক।

কাজেই মিসেস থুল আর হোমের অন্যান্য মানুষজন সবসময়েই একটা সতর্ক দৃষ্টি রাখে যেন কেভিন কোনো অঘটন ঘটাতে না পারে। ছোট ছেলে মেয়েরা যেন কেভিনের খপ্পড়ে পড়ে না যায় সেটা সবসময়েই তাদের চোখে চোখে রাখতে হয়।

তারপরেও মাঝে মাঝে ছোট খাটো অঘটন ঘটে যায়। হেমন্তের শুরুতে একদিন বিকাল বেলা এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেলো। ওরিওন চিলড্রেন্স হোমের কম্পাউন্ডটা অনেক বড়, এখানে খেলার মাঠ আছে, সুইমিংপুল আছে, গাড়ী পার্ক করার বড় পার্কিং লট আছে, ছোট একটা হ্রদ আছে এবং হ্রদের তীরে অনেক গাছ আছে। হেমন্তের শুরুতে সেই গাছের পাতার রং বদলে যায়, কয়েকটা দিন খুব অদ্ভুত দেখায়, মনে হয় গাছগুলোতে বুঝি আগুন ধরে গেছে। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য বেশিরভাগ সময়েই ছোট শিশুদের নজর এড়িয়ে যায়, তাদের দৈনন্দিন জীবনে আরো উত্তেজনার বিষয় থাকে। কিন্তু যে কারণেই হোক বাপ্পী এই বিষয়গুলো উপভোগ করে। সুযোগ পেলেও নিয়ম বহির্ভূত জেনেও সে কনকনে শীতের ভেতর হ্রদের পাড় দিয়ে হেঁটে বেড়ায়।

বিকেল বেলায় যখন সবারই একটা বড় হলঘরে পাশাপাশি শুয়ে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে নেওয়ার কথা তখন বাপ্পী সেখান থেকে বের হয়ে হেঁটে হেঁটে হ্রদের

তীরে চলে এসেছে। সে একা একা সেখানে হাঁটছে এবং নিজের মনে নিজের সাথে কথা বলছে। তার সব কথাই হয় তার মা'কে নিয়ে– তার মা তাকে নিয়ে কী করবেন সেসব নিয়ে এক ধরনের ফ্যান্টাসী।

বাপ্পী যে একা একা হ্রদের তীরে হাঁটছে সেটা আর কেউ দেখে নি, দেখেছে শুধু কেভিন। দেখার পর তার সেটা বড় কাউকে জানানোর কথা কিন্তু সে সেটা কাউকে জানালো না, সে নিজেও গোপনে বের হয়ে এলো। কেভিনের সাথে বাপ্পীর দেখা হলো বড় মেপল গাছটার নিচে। কেভিন মুখ শক্ত করে জিজ্ঞেস করল, "এখানে কী করছ?"

অন্য যে কোনো বাচ্চা এরকম একটা জায়গায় কেভিনের সাথে দেখা হলে আতংকে চমকে উঠতো কিন্তু কী কারণ জানা নেই, বাপ্পী সেভাবে চমকে উঠল না। বেশ শান্ত ভাবেই বলল, "হাঁটছি।"

"কেন হাঁটছ?"

"আমার ইচ্ছে করছে।"

একজন মানুষ যত পাষণ্ডই হোক একেবারে সরাসরি মারপিট শুরু করতে পারে না। মারপিট করার জন্যে একটা পরিবেশ তৈরি করতে হয়। কেভিল এবারে সেটা তৈরি করার কাজে এগিয়ে এলো, বলল, "বিড় বিড় করে করে কার সাথে কথা বল?"

বাপ্পী বলল, "কারো সাথে না।"

"আমি দেখেছি তুমি বলেছ।"

বাপ্পী জানে সে বলেছে তারপরেও সে মুখ শক্ত করে বলল, "বলি নাই।"

কেভিন চোখ লাল করে বলল, "বলেছ। আমি জানি তুমি বলেছ। কারা বিড় বিড় করে কথা বলে তুমি জানো?"

বাপ্পী এই প্রশ্নের উত্তর দিলো না, তাই কেভিন নিজেই উত্তর দিলো, বলল, "পাগলেরা। যাদের মাথা খারাপ। তারা। যাদের ব্রেন নষ্ট তারা।"

বাপ্পী এই কথাগুলোও ধৈর্য্য ধরে শুনলো। কেভিন তখন আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলো, বলল, "তোমার মাথা খারাপ। তোমার ব্রেন নষ্ট। তুমি পাগল।"

বাপ্পী বলল, "আমি পাগল না।"

কেভিন বলল, "তুমি পাগল। তোমার মা পাগল। তোমার বাবা পাগল, তোমার চৌদ্দ গুষ্ঠী পাগল।"

বাপ্পী এই প্রথমবার একটু রেগে উঠল, সে গম্ভীর গলায় বলল, "আমার মা মোটেও পাগল না। আমার মা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে সুইট মহিলা। আমার মা একদিন এখান থেকে আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবে।"

"কচু নিয়ে যাবে। তোমার মা কোনোদিন তোমাকে দেখতেও আসে না। কেন আসে না জান? আসে না কারণ তোমার মা জানে তুমি পাগল। তোমাকে এখন পাগলা গারদে পাঠাবে!"

বাপ্পী বলল, "পাঠাবে না।"

"একশবার পাঠাবে। তোমার মা হচ্ছে ডাইনী বুড়ী। ডাইনী বুড়ীরা তার বাচ্চাদের পাগলা গারদে আটকে রাখে। আমি জানি–"

বাপ্পী চিৎকার করে বলল, "খবরদার আমার মা'কে তুমি ডাইনী বুড়ী বলবে না।"

কেভিন এক পা এগিয়ে এসে বলল, "আমি বলব। আমি একশবার বলব। তোমার মা হচ্ছে ডাইনী বুড়ী। ডাইনী বুড়ী! ডাইনী বুড়ী! ডাইনী বুড়ি।"

বাপ্পী চিৎকার করে বলল, "খবরদার–"

কেভিন চোখ লাল করে বলল, "তোর এতো বড় সাহস তুই আমাকে খবরদার বলিস? আমি তোকে খুন করে ফেলব!" বলে সে ধাক্কা দিয়ে বাপ্পীকে নিচে ফেলে দিলো।

বাপ্পী উঠে বসার আগেই কেভিন এসে তার পেটে একটা লাথি মেরে বসলো, সাথে সাথে বাপ্পীর মনে হলো পুরো পৃথিবীটা বুঝি অন্ধকার হয়ে গেছে। তার কিছুক্ষণ লাগলো স্বাভাবিক হতে, যখন শেষ পর্যন্ত সে সামলে নিয়েছে তখন কেভিন তার চুলের মুঠি ধরে টেনে উপরে তুলে তার পেটে আরেকটা ঘুষি মেরেছে। বাপ্পী তখন আবার নিচে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। কেভিন এবারে তার উপরে চড়াও হয়ে বসে বাপ্পীর মাথাটা মাটিতে ঠেসে ধরে বলল, "কুকুরীর বাচ্চা। তুই বল যে তোর মা হচ্ছে ডাইনী বুড়ী। বল। বল তুই। তা না হলে খুন করে ফেলব।"

বাপ্পী মাথাটা মুক্ত করার চেষ্টা করতে করতে বলল, "আমার মা ডাইনী বুড়ী না।"

"বল তোর মা ডাইনী বুড়ী, বল।" কেভিন হিংস্র গলায় বলল, "বল। তা না হলে তোকে আজ খুন করে ফেলবো। এই মাটিতে আমি পুঁতে ফেলব। বল।"

বাপ্পী গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে বলল, "বলব না।"

"বলবি না? তাহলে দেখ আজকে আমি তোর কী অবস্থা করি–" বলে সে বাপ্পীর মাথাটা মাটিতে শক্ত করে ঠুকে দিলো।

ঠিক তখন একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল। এতোক্ষণ বাপ্পী নিজেকে মুক্ত করার জন্যে প্রাণপনে চেষ্টা করছিলো, কেভিন দেখলো বাপ্পী হঠাৎ হুটোপুটি বন্ধ করে গুটি শুটি মেরে শুয়ে পড়েছে। কেভিন প্রথমে ভাবলো এটা হচ্ছে পুরোপুরি ভাবে আত্মসমর্পন। তাই তখন তাকে আরো জোরে চেপে ধরে শক্ত কয়েকটা ঘুষি দেবার জন্যে হাত উপরে তুললো। তখন লক্ষ করলো বাপ্পীর সারা শরীর কাঁপছে, সাধারণ কোনো কাঁপুনী নয় ভয়ংকর এক ধরনের কাঁপুনী তার সাথে সাথে মুখ থেকে বিচিত্র এক ধরনের শব্দ বের হচ্ছে যেটি অনেকটা হাসির মতো শব্দ। হঠাৎ বাপ্পী মাথা ঘুরিয়ে কেভিনের দিকে তাকালো এবং তার চেহারা দেখে কেভিন আতংকে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

বাপ্পীর চোখের নিচে গাঢ় কালো রং, দেখে মনে হয় সেগুলো গভীরে ঢুকে গেছে৷ সেই চোখ থেকে নীল রংয়ের আলো বের হচ্ছে। মুখটি বিকৃত এবং তার ভেতর থেকে লকলকে সাপের মতো এক ধরনের জিব বের হয়ে আবার ভেতরে ঢুকে গেলো। সাথে সাথে পুরো এলাকাটি একটা বিকট দুর্গন্ধে ঢেকে গেলো। পচা মাংশের মতো এক ধরনের দুর্গন্ধ। বাপ্পী তার হাতটা সামনে তুলে ধরে, সেই হাতের চামড়ায় ঘন কালো লোম এবং মনে হয় তার নিচে কিছু একটা কিলবিল করে নড়ছে। দেখতে দেখতে হাতের নখগুলো বেরিয়ে এসে কুঁকড়ে গেলো। বাপ্পী তখন দ্বিতীয়বার তার মুখটি খুলে। মুখে দু'পাটি ধারালো দাঁত, দু'পাশের দুটি দাঁত মুখ থেকে বের হয়ে এসেছে। সে জিহ্বাটা আবার বের করে আনে। সাপের মতো লক লক করে সেটা বের হয়ে নড়তে থাকে।

বাপ্পীর মুখ থেকে তখন অশ্রাব্য গালির মতো কিছু শব্দ বের হয়ে আসে। প্রাচীন কোনো ভাষার শব্দ যার একটিও কেভিন বুঝতে পারল না।

কেভিন আতংকে চিৎকার করে ছুটতে শুরু করে, কিন্তু সে বেশিদূর যেতে পারল না, শোয়া অবস্থা থেকে প্রায় এক লফ দিয়ে শূন্যে একটা ডিগবাজী দিয়ে বাপ্পীর দেহে ভর করা প্রাণীটা কেভিনের সামনে এসে পড়ল, তারপর কেভিনের দিকে এগিয়ে এলো। কেভিন চিৎকার করে উল্টোদিকে ছুটে যেতে চেষ্টা করলো কিন্তু ততক্ষণে বাপ্পী তাকে ধরে ফেলেছে– যদি এই প্রাণীটিকে আসলে বাপ্পী বলা যায়।

কেভিন একটা আর্ত চিৎকার করে কয়েক সেকেন্ডের মাঝে জ্ঞান হারালো।

মিসেস থুল বাপ্পীর দিকে অবাক হয়ে তাকালেন, তার চুল এলোমেলো এবং গায়ের কাপড়ে মাটি এবং শুকনা পাতা। চোখের দৃষ্টি বিভ্রান্ত, দেখে মনে হয় শরীরে কোনো জোর নেই, সোফাটাতে ধপ করে বসে সে মাথাটা হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করল।

মিসেস থুল এগিয়ে এসে বললেন, "বাপ্পী, সোনা তোমার কী হয়েছে?"

"আমার খুব ঘুম পাচ্ছে মিসেস থুল।"

"তোমার এই অবস্থা কেন? তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

"লেকের পাশে?"

"লেকের পাশে আবার একা একা গিয়েছ?"

বাপ্পী মিসেস থুলের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিড় বিড় করে বলল, "কেভিন মনে হয় মরে গেছে।"

মিসেস থুল তার চেয়ার থেকে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে বললেন, "কী বললে?"

বাপ্পী ঘুম ঘুম গলায় বলল, "কেভিন। কেভিন মনে হয় মরে গেছে।"

"মরে গেছে? কোথায় মরে গেছে?"

"লেকের পাড়ে। আমাকে মারছিলো তারপর আমার কিছু মনে নাই। একটু আগে দেখেছি কেভিন একটা গাছ থেকে ঝুলছে। মনে হয় মরে গেছে। শরীরে অনেক রক্ত।"

"রক্ত!" মিসেস থুল আর্তনাদ করে বললেন, "রক্ত?"

বাপ্পী কোনো উত্তর দিলো না, মিসেস থুল দেখলেন সে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেছে।

গভীর রাতে নীরার টেলিফোন বাজতে থাকে, নীরা একটু বিরক্ত হয়ে টেলিফোন ধরল, "হ্যালো?"

"মিস নীরা?"

"হ্যাঁ। কথা বলছি।"

"আমি মিসেস থুল বলছি। ওরিওন চিলড্রেন্স হোমের ডিরেক্টর। একটা খুব জরুরী প্রয়োজনে ফোন করছি।"

"কী প্রয়োজন।"

"আপনার ছেলে বাপ্পীকে নিয়ে একটা ঘটনা ঘটেছে, অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা। আপনাকে একটু আসতে হবে।"

নীরা আধশোয়া হয়ে বসেছিলো, এবারে সোজা হয়ে বসলো। সে বহুদিন থেকে জানে আগে হোক পরে হোক তার ছেলে বাপ্পীকে নিয়ে অবিশ্বাস্য অনেক ঘটনা ঘটবে। জিজ্ঞেস করল, "কী ঘটনা?"

"সামনা সামনি এলে ডিটেল্‌স বলব, এখন যেটুকু বলা যায় সেটা এরকম। বাপ্পী কেভিন নামে একটা ছেলেকে পিটিয়ে প্রায় মেরে ফেলেছে।"

"মেরে ফেলেছে?"

"না, মেরে ফেলে নি । প্রায় মেরে ফেলেছে। কেভিন এখনো বেঁচে আছে। বেঁচে থাকবে কী না সেটা এখনো বোঝা যাচ্ছে না। বলতে পারেন শরীরের প্রত্যেকটা হাড় ভেঙ্গে ফেলেছে!"

"বাপ্পী কেভিনের শরীরের প্রত্যেকটা হাড় ভেঙ্গে ফেলেছে?"

"আমি জানি সেটা সম্ভব নয়। বাপ্পী ছোট একটা ছেলে, কেভিন বিশাল। এটা সম্ভব নয়- কিন্তু পুলিশ তাই বলছে। বাপ্পীর নখের মাঝে যে টিস্যু পেয়েছে সেগুলো কেভিনের শরীরের। অন্যান্য প্রমাণও আছে। আপনাকে একটু আসতে হবে, সামনা সামনি কথা বলব।"

নীরা ইতস্তত করে বলল, "আমি খুব ব্যস্ত, দেখি কী করা যায়।"

মিসেস থুল কঠিন গলায় বললেন, "মিস নীরা। বাপ্পী আপনার সন্তান, আপনি তাকে জন্ম দিয়েছেন। তার ভালোমন্দের দায়িত্ব আপনার। আপনি চাইলেও আপনার, না চাইলেও আপনার। সমাজ সেভাবে বলে, আর সমাজের ব্যাপারে আপনার যদি আগ্রহ না থাকে, দেশের আইনও তাই বলে।"

কথা শেষ করে মিসেস থুল খট করে টেলিফোন রেখে দিলেন।

নীরা কিছুক্ষণ টেবিলে পা তুলে বসে রইলো তারপর টেলিফোন হাতে নিয়ে একটা নম্বর ডায়াল করল, অন্যপাশে ঘুম জড়িত একটা কণ্ঠ শোনা যায়, "হ্যালো।"

"লীডার?"

কোরায়শী বলল, "নীরা? এতো রাত্রে।"

"হ্যাঁ। বাপ্পীর হোম থেকে এক্ষুণি ফোন করেছিলো, বাপ্পী একটা ছেলেকে নাকী পিটিয়ে প্রায় মেরে ফেলেছে।"

এক মুহূর্তে কোরায়শীর চোখের ঘুম উবে গেলো। সে আনন্দের একটা ধ্বনী করে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি!"

"আমাদের এতোদিনের অপেক্ষার দিন তাহলে শেষ হয়েছে! নীরা– লুসিফার আসছে আমাদের কাছে! দেখা দিচ্ছে।"

"হ্যাঁ দেখা দিচ্ছে।"

"ডিটেলস জান কিছু? কেমন করে হলো? কী হলো?"

"না।" নীরা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি এখন কী করব? হোমের ডিরেক্টর ইজ এ বীচ। আমাকে এক্ষুণি যেতে বলেছে।"

"যাও। চলে যাও। বাপ্পীকে নিয়ে এসো। আমরা আমাদের কাজ শুরু করি। অনেকদিন অপেক্ষা করেছি। এই দিনটার জন্যে আমরা একদিন দুদিন নয়, ছয় বছর অপেক্ষা করেছি!"

"হ্যাঁ। যাব। পুলিশ কোনো ঝামেলা করবে না তো?"

"আরে না! পুলিশ কোনো কেসই দাঁড়া করতে পারবে না। লুসিফারের দোহাই লাগে ঐ গবেট ছেলেটা যেন খরচা হয়ে যায়। যদি খরচা না হয়, জ্ঞান ফিরে আসে কথাবার্তা বলে তখন মনে হয় লোকজন কিছু খবর পাবে, কিন্তু সেগুলো কেউ বিশ্বাস করবে না।"

"না। বিশ্বাস করবে না।"

"আর করলেই সমস্যা কী? ছয় বছরে একটা বাচ্চার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল কেস করবে নাকী? ওদেরকে বলতেই হবে অন্য কিছু হয়েছিলো, ঠিক তখন বাইরে থেকে কোনো ম্যানিয়াক ঢুকে পড়েছিলো সেরকম কিছু।"

"তা ঠিক।"

"যাই হোক নীরা। তোমাকে অভিনন্দন।"

"থ্যাংকস লীডার। কিন্তু আমাকে অভিনন্দন দেয়ার কি আছে আমি তো কিছুই করি নি। আপনারা আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি কিছু করি নি।"

"করেছ নীরা করেছ। তুমি তোমার বাচ্চাটাকে দিয়েছ। এই নির্বোধের পৃথিবীতে একরকম আঠা আঠা ভাবালুতা আছে– মা আর সন্তানের হাস্যকর ভালোবাসার সম্পর্ক আছে– তুমি তার উপরে উঠতে পেরেছ। তোমাকে যদি অভিনন্দন না দিই তাহলে কাকে দেব?"

নীরা কোনো কথা না বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

নীরা গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে। তার পাশের সীটে বাপ্পী বসেছে, বাপ্পীর মুখে এক ধরনের জ্বলজ্বলে আনন্দ। সে বলল, "আম্মু আমি জানতাম তুমি আমাকে নিতে আসবে।"

নীরা কোনো কথা বলল না। বাপ্পী আবার বলল, "আমি মিসেস থুলকে বলেছি, প্যাট্রিশিয়াকে বলেছি, জনকে বলেছি তুমি একদিন এসে আমাকে নিয়ে যাবে। তারা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে নাই।"

নীরা এবারেও কোনো কথা বলল না। বাপ্পী বলল, "বিশ্বাস না করলে নাই। এখন তুমি এসেছ না নিতে?"

নীরা অস্পষ্ট একটা শব্দ করল, তার অর্থ হ্যাঁ বা না দুটোই হতে পারে। বাপ্পী বলল, "আমার কথা সবচেয়ে কম বিশ্বাস করেছে কে জান?" নীরা জানতে চাইলো না মানুষটি কে। তখন বাপ্পী নিজেই বলল, "কেভিন। কেভিন একটুও বিশ্বাস করে নাই। সে কী করেছে জান আম্মু?"

এই প্রথম নীরা একটা শব্দ উচ্চারণ করল, জিজ্ঞেস করল, "কী করেছে?"

"লেকের পাড়ে আমার পেটে ঘুষি মেরেছে, লাথি মেরেছে।"

"তুমি কী করেছ?"

"আমি কিছু করি নাই।"

"কেভিন কেন তোমাকে লাথি ঘুষি মেরেছে?"

এবারে বাপ্পী চুপ করে রইল, তখন নীরা আবার জিজ্ঞেস করল, "কেন কেভিন তোমাকে লাথি ঘুষি মেরেছে?"

বাপ্পী নিচু গলায় বলল, "কেভিন আমাকে একটা কথা বলতে বলেছিল। আমি বলতে রাজী হই নাই সেই জন্যে মেরেছে।"

"তোমাকে কী বলতে বলেছিলো?"

"খারাপ কথা আম্মু।"

"কী খারাপ কথা?"

"তোমাকে নিয়ে একটা খারাপ কথা।"

নীরা একটু অবাক হয়ে বাপ্পীর দিকে তাকালো, "আমাকে নিয়ে?"

"হ্যাঁ।" বাপ্পী মাথা নাড়ল, "কেভিন বলেছে তুমি নাকী ডাইনী বুড়ী।"

"আমি ডাইনী বুড়ী?"

বাপ্পী হাসির মতো একটা শব্দ করল, বলল, "মানুষ কখনো ডাইনী বুড়ী হতে পারে?"

নীরা কথাটার কোনো উত্তর দিলো না, বাপ্পী জানে না মানুষ আসলে ডাইনী বুড়ী হতে পারে। কেভিন ভুল বলে নাই, নীরা আসলে সত্যিই ডাইনী বুড়ী। তারা এখন যেটা করে দুইশ বছর আগে সেই কাজ করার জন্যে ইউরোপে আমেরিকায় অনেক মহিলাকে ডাইনী বুড়ী অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে।

বাপ্পী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আম্মু।"

নীরা গম্ভীর গলায় বলল, "বল।"

"কেভিনের কি হয়েছে আম্মু।"

নীরা বলল, "কেউ একজন কেভিনকে মেরেছে।"

"কে মেরেছে আম্মু?"

"সবাই বলছে তুমি মেরেছে!"

ব্যাপারটা এতোই অবাস্তব যে বাপ্পী সেটাকে এক ধরনের ঠাট্টা হিসেবে বিবেচনা করে একটু হাসলো। কয়েক সেকেন্ড কিছু একটা চিন্তা করে বাপ্পী বলল, "আমার কী মনে হয় জান আম্মু?"

"কী?"

"লেকের পাড়ে আরো একজন মানুষ ছিলো। সেই মানুষটা যখন দেখেছে কেভিন আমাকে মারছে তখন সে খুব রাগ হয়ে কেভিনকে মেরেছে।"

নীরা বলল, "ওখানে আর কেউ ছিল না।"

"ছিল।" বাপ্পী গম্ভীর হয়ে বলল, "নিশ্চয়ই ছিল।"

নীরা নিঃশব্দে গাড়ী চালাতে থাকে। বাপ্পী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আম্মু।"

নীরা অস্বস্তিতে একটু নড়ে উঠে, সে আসলে "আম্মু" ডাকটাতে অভ্যস্ত নয়। যতবার বাপ্পী তাকে আম্মু বলে সম্বোধন করছে ততবার সে ভেতরে ভেতরে চমকে

উঠছে। তার জন্যে ব্যাপারটা অনেক সহজ হতো যদি বাপ্পী তাকে মিসেস নীরা বলে ডাকতো। এক দুইবার তার মনে হয়েছে বাপ্পীকে সে সেটা বলে দেয়। শেষ পর্যন্ত বলতে পারে নি।

বাপ্পী আবার ডাকলো, "আম্মু।"

নীরা অস্পষ্ট স্বরে বলল, "উঁ।"

"কেভিন কী মরে যাবে?"

"না। ডাক্তার বলেছে এইবার বেঁচে যাবে। কিন্তু তাকে অনেকদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। অ-নে-ক-দি-ন!"

"কেভিনের কী জ্ঞান হয়েছে?"

"একটু একটু।"

বাপ্পী একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, "তাহলে কেভিনকে কেন জিজ্ঞেস করে না, তাকে কে মেরেছে!"

"করেছে।"

"কেভিন কী বলেছে?'

"কেভিন বলেছে তুমি মেরেছ।"

বাপ্পী কয়েক মুহূর্ত অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে নীরার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "কেভিনটা সবচেয়ে পাজী। সবসময় মিথ্যা কথা বলে। এখনও মিথ্যা কথা বলছে।"

নীরা কোনো কথা বলল না।

প্রায় চারঘণ্টা গাড়ী চালিয়ে নীরা যখন তার নিজের ফ্ল্যাটে এসেছে তখন অনেক রাত। বাপ্পী গাড়ীর সিটে ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে। গাড়ীর সিট বেল্ট দিয়ে বাধা আছে বলে তার ঘুমের ভঙ্গীটা খুব বিচিত্র, সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে সে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে আছে।

নীরা তাকে ঘুম থেকে উঠানোর চেষ্টা করল, কিন্তু বাপ্পী ঘুম থেকে উঠল না, বিড় বিড় করে কিছু একটা বলে পাশ ফিরে সে ঘুমিয়ে রইল।

নীরা বাপ্পীর দিকে তাকালো, ছয় বছরের হালকা পাতলা একটা শরীর তাকে কোলে করে নিতে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যাটা অন্য জায়গায়– নীরা কখনোই

কারো জন্যে এতটুকু ভালোবাসা কিংবা মায়া মমতা দেখায় নি। নিজের সন্তানকে বুকে জড়িয়ে কোলে করে তুলে নেয়ার মাঝে সন্তানের প্রতি স্নেহ দেখানোর একটা ব্যাপার আছে, সে এই স্নেহটা দেখাতে চাইছে না। তাই সে বাপ্পীকে আরো কয়েকবার ঘুম থেকে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু কোনো লাভ হলো না।

তাই শেষ পর্যন্ত নীরা বাপ্পীকে কোলে তুলে নেয়, ঘুমন্ত বাপ্পীকে দেখে মনে হয় সে বুঝি ঠিক এই মুহূর্তটার জন্যে অপেক্ষা করেছিলো। বাপ্পী দুই হাতে নীরার গলা জড়িয়ে ধরে তার ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমের মাঝেই বিড় বিড় করে নিজের মনে কিছু একটা বলল। কথাগুলোর মাঝে নীরা শুধু আম্মু শব্দটাই আলাদা করে ধরতে পারলো। বাপ্পীকে কোলে করে উপরে নিতে নিতে নীরা হঠাৎ করে বুঝতে পারে এই ছোট শিশুটার জন্যে সে এক ধরনের স্নেহ অনুভব করছে। নীরা জোর করে ভেতর থেকে স্নেহের অনুভূতিটা সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কোরায়শীর দলের সাথে সে যখন থেকে প্রেত সাধনা শুরু করেছে তখন থেকে সে জানে স্নেহ মায়া মমতা আসলে এক ধরনের দুর্বলতা। বুকের ভেতরে এই স্নেহ মায়া মমতার কোনো স্থান নেই।

সবকিছু জানার পর, বিশ্বাস করার পরও নীরা ঘুমন্ত বাপ্পীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই তার বুকের ভেতরে এক ধরনের মমতার জন্ম হতে থাকে। সম্পূর্ণ অপরিচিত এই অনুভূতিটির সাথে নীরার পরিচয় নেই, এই অনুভূতিটির সাথে কেমন করে থাকতে হয় সেটাও সে জানে না।

খুব ভোর বেলা, নীরার ফ্ল্যাটে কলিং বেল বেজে উঠে। দরজা খুলে নীরা দেখে বাইরে কোরায়শী এবং আরো দুইজন দাঁড়িয়ে আছে। এজন পুরুষ, সম্ভবত ইউরোপের, উঁচু চোয়াল এবং সোনালী চুল। অন্যজন মহিলা, কালো হিস্পানিক চুল দেখে মনে হয় মেক্সিকোর।

কোরায়শী মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "বেশি সকালে চলে এসেছি নাকী?"

"না লীডার। বেশি সকাল নয়।"

"ছেলেটাকে দেখতে এলাম। আমাদের এতো বড় একটা প্রাইজ ভাবলাম নিজের চোখে একটু দেখে যাই।"

"এখনো ঘুমুচ্ছে। অনেক ধকল গিয়েছে তো।"

"সেটাই ভালো, ঘুমন্ত অবস্থাতেই দেখি।"

"আসেন আমার সাথে।"

তিনজন নীরার পিছু পিছু শোওয়ার ঘরে যায়। বড় বিছানায় বাপ্পী গুটি গুটি মেরে শুয়ে আছে। কোরায়শী ভুরু কুঁচকে বলল, "রাতে তোমার সাথে ঘুমিয়েছে নাকী?"

নীরা একটু ইতস্তত করে বলল, "হ্যাঁ। রাতে আমার বিছানায় চলে এলো।"

কোরায়শী মাথা নড়ল, বলল, "না না। এটা ঠিক নয়– একজন মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে মায়া মমতা। ছোট বাচ্চাদের এজন্যে দূরে রাখতে হয়। যাকে তুমি দুদিন পরে স্যাক্রিফাইস করবে আজকে তাকে তুমি নিজের কাছে রাখছ কেন?"

নীরা মাথা নিচু করে বলল, "সরি লীডার।"

"শুধু মুখে সরি বললে হবে না, তোমার কাজ কর্মেও এটা দেখাতে হবে।"

"আমি কী সেটা দেখাই নি?"

"হ্যাঁ। দেখিয়েছ। সেজন্যেই তোমার উপরে আমরা এতো নির্ভর করি।" কোরায়শী সুর পাল্টে বলল, "যাই হোক আমাদের এখনই পুরো পরিকল্পনাটা করে ফেলা দরকার।"

ইউরোপিয়ান পুরুষ এবং মেক্সিকান মহিলাটা এক সাথে মাথা নাড়ল। কোরায়শী বলল, "হলঘরের দায়িত্ব কে নেবে?"

সোনালী চুলের ইউরোপিয়ান ধাঁচের মানুষটি বলল, "গতবারের হল ঘরে যদি তোমাদের আপত্তি না থাকে তাহলে আমি দায়িত্ব নিতে পারি।"

কোরায়শী বলল, "গতবারের হলঘরটা ভালো ছিলো। একটু ছোট কিন্তু সিকিউরিটি খুব ভালো ছিল। এই হলে কাজ চলে যাবে। তুমি তাহলে ব্যবস্থা কর।"

সোনালী চুলের মানুষটি মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে।"

কোরায়শী এবারে মেক্সিকান হিস্পানিক মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি তাহলে আমাদের কোভেন্টের মেম্বরদের ডাকো। মনে থাকে যেন শুধুমাত্র সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স যাদের আছে তাদেরকে ডাকা হবে।"

হিস্পানিক মহিলা মাথা নেড়ে বলল, "আমাদের অনুষ্ঠানটা কী রকম হবে?"

"খুব সোজা আর সুনির্দিষ্ট। রাত সাড়ে এগারোটার ভেতরে সবাই চলে আসবে। পোষাক পরে বসে পড়বে। বারোটার সময় লুসিফারকে ডাকব–"

"কেমন করে?"

"কেন? নীরার ছেলেটিকে দিয়ে। এর মাঝে একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে– তোমরা সবাই সেটা জান।"

"কিন্তু কেমন করে ডাকবে?"

"আমরা দেখেছি ছেলেটাকে টর্চার করা হলে সে একসময়ে ভেঙ্গে পড়ে, তখন লুসিফার তার উপর ভর করে।"

নীরা শুকনো গলায় বলল, "বাপ্পীকে টর্চার করা হবে?"

কোরায়শী হা হা করে হেসে বলল, "ক্লাসিকেল টর্চার নয় যে চাবুক দিয়ে মারলাম, বা টেনে নখ তুলে দিলাম! আমরা যন্ত্রণা তৈরি করার একটা ইনজেকশান দিতে পারি, কিংবা আরো সোজা হয় যদি ইলেকট্রিক শক দিই। আস্তে আস্তে ভোল্টেজ বাড়াব।"

ইউরোপিয়ান ধাঁচের মানুষটি বলল, "লীডার, কিন্তু এর মাঝে একটা বিপদের ঝুঁকি আছে।"

"কি ঝুঁকি?"

"নীরার বাচ্চাটির উপর যখন লুসিফার ভর করেছিলো তখন কী হয়েছিলো মনে আছে?"

"কী হয়েছিলো?"

"লুসিফার ক্রুদ্ধ হয়ে কেভিন নামে বাচ্চাটাকে শরীরের প্রত্যেকটা হাড় ভেঙ্গে ফেলেছিলো। এখানেও যদি সেরকম কিছু হয়? বাচ্চাটাকে টর্চার করার জন্যে লুসিফার যদি আমাদের উপর খেপে উঠে?"

কোরায়শী মাথা নাড়ল, বলল, "না হবে না। আমরা তখন সবাই লুসিফারের বন্দনা করতে থাকব। লুসিফারকে ডাকতে থাকব। লুসিফার যখন আসবে সে এসে ক্রুদ্ধ হবে না, সে আনন্দিত হবে!"

"আমরা সেটা করতে পারব?"

কোরায়শী বলল, "তোমরা আমার উপর বিশ্বাস রাখো। আমি চতুর্থ স্তরে উঠেছি। আমি এগুলো খুব ভাল করে জানি। আর একটা স্তর উঠতে পারলে আমি নিজেই লুসিফারকে ডেকে আনতে পারব। এই অনুষ্ঠান দিয়ে আমি সেই স্তরে উঠব। তোমরা সবাই এক স্তর উপরে উঠবে।"

"ঠিক আছে লীডার।"

কোরায়শী নীরার দিকে তাকিয়ে বলল, "তাহলে নীরা তুমি সময়মতো বাচ্চাটিকে নিয়ে এসো। বাচ্চাটার ডায়েটে প্রোটিন যেন বেশি না হয়। বেশি মিষ্টি খেতে দিও না। ঘুম যেন কম না হয়।"

নীরা কোনো কথা না বলে মাথা নাড়ল। কোরায়শী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমরা যাই। অনেক কাজ বাকী।"

নীরাও উঠে দাঁড়াল, বলল, "লীডার।"

"বল।"

"আমার একটা প্রশ্ন ছিলো।"

"কী প্রশ্ন?"

"বাপ্পীর উপর লুসিফার ভর করার পর যখন সে চলে যবে তখন কী হবে?"

"সেটা অনেক দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। তোমাদের মাঝে কে কতটুকু গ্রহণ করবে তার উপর নির্ভর করবে।"

"না-না–" নীরা মাথা নেড়ে বলল, "আমি আমাদের কথা বলছি না। বাপ্পীর কথা বলছি। তার কী হবে?"

"সে আর সুস্থ হতে পারবে না। পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে যাবে। বাকী জীবন ইনস্টিটিউশনে থাকতে হবে।" কোরায়শী ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি এটা কেন জানতে চাইছ?"

"না। এমনিই।"

কোরায়শী কিছুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে নীরার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "নীরা।"

"বলেন লীডার।"

"আমি তোমার ভিতরে এক ধরনের দুর্বলতার লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।"

"না লীডার। আমার ভেতরে কোনো দুর্বলতা নেই।"

কোরায়শী ক্ষীণ গলায় বলল, "না থাকলে ভালো। আর যদি থাকে তাহলে জেনে রাখো তোমার ছেলের ভাগ্য কিন্তু ছয় বছর আগে নির্ধারিত হয়ে গেছে। যদি আমরা তাকে ব্যবহার নাও করি, আগে হোক পরে হোক লুসিফার তাকে ব্যবহার করবে। ব্যবহার করে তাকে কিন্তু শেষ করে দেবে। কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। বুঝেছ?"

নীরা মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি।"

"গত ছয় বছর এই বাচ্চাটিকে হোমে রেখে বড় করার খরচ কিন্তু আমরা দিয়ে এসেছি। বাচ্চাটি কিন্তু তোমার না, বাচ্চাটি আমাদের। বুঝেছ?"

নীরা মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি।"

"কাজেই তুমি তোমার মাথার ভেতরে কোনো রকম দুর্বলতার স্থান দিও না।"

"দিব না।"

ভোর বেলা বাপ্পী ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে নীরার কাছে এসে বসল। নীরা চোখের কোণা দিয়ে বাপ্পীর দিকে তাকায়, এই ছোট বাচ্চাটি এখনো জানে না তাকে নিয়ে কী ভয়ংকর একটা পরিকল্পনা করা হয়েছে। দুদিন পর তার হাত পা বেঁধে মুখ কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা হবে তারপর তাকে ইলেকট্রিক শক দেয়া হতে থাকবে, প্রচণ্ড যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করতে থাকবে এবং লুসিফার এসে তার উপর ভর করবে। লুসিফার যখন ফিরে যাবে তখন এই ফুটফুটে বাচ্চাটি পুরোপুরি উন্মাদ হয়ে যাবে– বাকী জীবনটুকু কাটাবে একটা ইনস্টিটিউশানে, চার দেয়ালের বদ্ধঘরে– একটা পাগলা গারদে।

নীরা বাপ্পীর দিকে তাকিয়ে থাকে, তার পেটে জন্ম না নিয়ে অন্য কারো পেটে জন্ম নিলে কী এই শিশুটির জীবনটুকু এরকম ভয়ংকর একটা জীবন হতো?

বাপ্পী নীরার কোলে মাথা রেখে বলল, "আম্মু।"

নীরা অস্পষ্ট এক ধরনের শব্দ করে বলল, "উঁ।"

"আমি আর হোমে থাকব না আম্মু। আমি এখন থেকে তোমার সাথে থাকব।"

নীরা কোনো কথা না বলে বাপ্পীর মুখের দিকে তাকালো। বাপ্পী বলল, "আমার হোমে থাকতে ভালো লাগে না আম্মু।"

নীরা এবারেও কোনো কথা বলল না, বাপ্পী তখন একটু ব্যস্ত হয়ে বলল, "তুমি দেখো আম্মু আমি তোমাকে একটুও বিরক্ত করব না। আমি নিজে নিজে আমার ঘর পরিষ্কার করব। আমি থালা বাসনও ধুতে পারি– রাত্রি বেলা আমি টেলিভিশন দেখতে চাইব না, তুমি বললেই আমি ঘুমিয়ে যাব।"

নীরা বাপ্পীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, বাপ্পী ছলছল চোখে বলল, "প্লীজ আম্মু! আমাকে তুমি হোমে পাঠিও না। প্লীজ!"

নীরা অস্পষ্ট স্বরে বলল, "দেখি।"

নীরা দুপুর বেলা আবিষ্কার করল বাপ্পীকে খাওয়ানোর মতো কিছু বাসায় নেই, তাই সে তাকে নিয়ে বাসা থেকে বের হলো। সামনের সিটে বসিয়ে গাড়ীটা ছাড়তেই নীরা লক্ষ করল ঠিক পিছন থেকে একটা গাড়ী তার পিছন পিছন আসছে। লম্বা একটা মানুষ কালো চশমা পরে তাকে অনুসরণ করছে। আসলেই অনুসরণ করছে কী না সেটা নিশ্চিত করার জন্যে খামোখাই সে একটা ব্লক ঘুরে এলো এবং পিছনে গাড়ীটাও ঠিক তার পিছু পিছু সেই ব্লকটা ঘুরে এলো।

নীরা প্রথমে ভেবেছিলো কাছাকাছি একটা ম্যাকডোনাল্ডে বাপ্পীকে নিয়ে যাবে– ছোট বাচ্চারা কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে ম্যাকডোনাল্ডের অস্বাস্থ্যকর খাবার খেতে খুব পছন্দ করে। পেছনের গাড়ীটা দেখে নীরা তার মত পরিবর্তন করে, সে সবচেয়ে বড় শপিং মলটাতে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে মানুষের প্রচুর ভীড়, হরেক রকম দোকানপাট এবং খাওয়ার বিশাল ফুড কোর্টও রয়েছে। গাড়ী থেকে নেমে নীরা লক্ষ করল পিছনের গাড়ীটাও কাছাকাছি এসে থেমেছে। বাপ্পী এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে গাড়ী থেকে নামে– তার ছোট জীবনের পুরোটুকুই কেটেছে জেলখানার মতো একটা হোমে, বাইরের ছোট খাটো যেটাই দেখছে সে এখন মুগ্ধ হয়ে সেটা দেখছে। গাড়ী থেকে নেমে সে নীরার হাত ধরে পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। নীরা এর আগে কখনোই কারো হাত ধরেছে বলে মনে করতে পারে না– তার নিজের ভেতরে এক ধরনের অস্বস্তি হতে থাকে। বাপ্পী উত্তেজিত গলায় বলল, "আম্মু!"

নীরা অস্পষ্ট স্বরে বলল, "উঁ।"

"আমাদের কী মজা হচ্ছে। তাই না আম্মু?"

নীরা উত্তরে কী বলবে বুঝতে পারল না, অস্পষ্ট এক ধরনের শব্দ করল যার উত্তর হ্যাঁ কিংবা না দুটোই হতে পারে। বাপ্পী উৎসাহ নিয়ে বলল, "আমরা দুজন এখানে খাব, তাই না আম্মু?"

নীরা মাথা নাড়ল, বাপ্পী উত্তেজিত ভঙ্গীতে বলল, "আমাদের হোমে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেতে দেয় না আম্মু! আমরা এখানে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেতে পারি?"

নীরা নিচু গলায় বলল, "হ্যাঁ পারি।"

বাপ্পী শপিং মলটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আম্মু, এখানে কী খেলনার দোকান আছে?"

"থাকতে পারে।"

"যদি থাকে তাহলে আমরা খুঁজে বের করে ফেলব। তাই না আম্মু?"

নীরা মাথা নাড়ল।

শপিং মলের ফুড কোর্টে একটা হ্যামবার্গারের দোকান থেকে হ্যামবার্গার আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই নিয়ে দুজন খেতে বসে। বিশাল হলঘরের মতো এলাকায় মানুষজন বসে বসে খাচ্ছে, নীরা লক্ষ্য করল চোখে কালো চশমা পরা লম্বা মানুষটি তাদের কাছাকাছি একটা টেবিলে বসে এক মগ কফি নিয়ে চুমুক দিয়ে খাচ্ছে।

খাওয়া শেষ হবার পর দুজনে ফুড কোর্ট থেকে বের হলো, দুই পাশে অসংখ্য দোকান, আলো ঝলমলে সেই দোকানে হাজার রকম জিনিষ সাজানো। বাপ্পী চোখ বড়বড় করে সেগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ করে ছোট বাচ্চাদের একটা খেলার জায়গা পেয়ে যায়। বাপ্পী নীরার দিকে তাকিয়ে বলল, "আম্মু, আমি ওখানে গিয়ে খেলতে পারি?"

নীরা মাথা নাড়ল, বলল, "যাও।'

সাথে সাথে বাপ্পী ছুটে গেলো। অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে ছোটাছুটি করে সে খেলতে শুরু করে। খেলার জায়গা ঘিরে বাবা মায়েদের বসার জন্যে বেঞ্চ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। নীরা খালি একটা বেঞ্চে বসে অন্যমনস্ক ভাবে সামনে তাকিয়ে থাকে। ছোট বাচ্চাদের চেঁচামেচি চিৎকার শুনতে শুনতে হঠাৎ করে সে বুঝতে পারে জীবনের খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ সে কখনো দেখে নি।

"নীরা!"

গলার স্বর শুনে নীরা চমকে উঠে তাকিয়ে দেখলো কোরায়শী কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখে তেলতেলে এক ধরনের বিদ্রুপের হাসি। কোরায়শী হাসিটাকে আরো বিস্তৃত করে বলল, "তোমার কাছে বসতে পারি?"

নীরা হঠাৎ কেমন যেন এক ধরনের আতংক অনুভব করে, সে শুকনো মুখে বলল, "হ্যাঁ। বসতে পারেন লীডার।"

কোরায়শী তার পাশে বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসে বলল, "আমাকে আমাদের এজেন্ট খবর পাঠিয়েছে, বলেছে, তুমি নাকী রীতিমতো ক্লাসিকাল মা হয়ে গেছ, তাই দেখতে এলাম। এসে কী দেখছি জান?"

নীরা কোনো কথা বলল না, কোরায়শী মুখে বাঁকা এক ধরনের হাসি ফুটিয়ে বলল, "এসে দেখছি যে তুমি শুধু মা নয় রীতিমতো মাদার টেরেসা হয়ে গেছো। তাই তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি।"

"সাহায্য?"

কোরায়শী মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম মনের ভেতরে দুর্বলতাকে জায়গা দিয়ো না। মায়া মমতা নামে ঐ আঠা আঠা ন্যাকামোগুলো করতে যেও না। তুমি আমার কথাগুলো শুনলে না। বাচ্চাটার সাথে জড়িয়ে পড়েছ। কাজেই এখন আমাদের এসে তোমাকে সাহায্য করার দরকার হয়ে পড়েছে। বুঝেছ?"

নীরা মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি।"

"আমরা এসেছি বাচ্চাটাকে নিয়ে যেতে।"

নীরা কোনো কথা বলল না। কোরায়শী কঠিন মুখে বলল, "আমি দুইজনকে সাথে নিয়ে এসেছি। তারা বাচ্চাটাকে নিয়ে যাবে।"

নীরা এবারেও কোনো কথা বলল না। কোরায়শী কঠিন মুখে বলল, "তুমি বাচ্চাটাকে ডাকো। ডেকে বলো আমার সাথে যেতে।"

নীরা এবারেও কোনো কথা না বলে একটা নিঃশ্বাস ফেলল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, "সরি লীডার। আমি পারব না।"

কোরায়শী কিছুক্ষণ নীরার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর কঠিন গলায় বলল, "আমি ঠিক এরকম একটা জিনিষ সন্দেহ করছিলাম যে তুমি হয়তো এরকম একটা বোকামী করার চেষ্টা করবে। নীরা, আমি তোমাকে শেষবার বলছি বোকামি করো না। এই বাচ্চাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তোমার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। যেভাবেই হোক এই বাচ্চাটি আমার চাই। তার জন্যে যেটা দরকার হয় সেটাই করা হবে। দরকার হলে তোমাকে শেষ করে দেয়া হবে।"

নীরা এক ধরনের আতংক অনুভব করে। পৃথিবীর অল্প কিছু মানুষ আছে যাদের ভেতর বিন্দুমাত্র ভালোবাসা নেই, সমাজ দেশ আইন কানুন নিয়ম নীতি কোনো কিছুর তারা তোয়াক্কা করে না। তাদের প্রয়োজনের জন্যে তারা যা খুশী তাই করতে পারে। কোরায়শী ঠিক সেরকম একজন মানুষ। তার যেটা করার দরকার সে সেটাই করবে। যে কোনো মূল্যে সে বাপ্পীকে ছিনিয়ে নেবে।

কোরায়শী নীরার দিকে তাকিয়ে বলল, "নীরা। তুমি আমার দিকে তাকাও।"

নীরা তাকালো না, বলল, "না লীডার। আমি আপনার দিকে তাকাব না। আপনাকে আমি সম্মোহন করতে দিব না।"

"তুমি আমার দিকে তাকাও।"

"লীডার। আপনি আর একবার চেষ্টা করলে আমি চিৎকার করব, তখন কমপক্ষে এক ডজন সিকিউরিটি ছুটে আসবে। সেই চেষ্টা করবেন না।"

কোরায়শী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। কিন্তু তুমি শুনে রাখো, এই বাচ্চাটিকে লুসিফার নিজের হাতে স্পর্শ করেছিলো। লুসিফার তার ভেতরে আছে, আজ হোক কাল হোক লুসিফার বের হয়ে আসবে, পৃথিবীর কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। কেউ না।"

নীরা ফিস ফিস করে বলল, "পারবে! একজন তাকে রক্ষা করতে পারবে। আমি বাপ্পীকে তার কাছে নিয়ে যাব।"

কোরায়শী এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

গাড়ী স্টার্ট করে নীরা রিয়ার ভিউ মিররে পিছন দিকে তাকালো। পার্কিং লট থেকে নীল রংয়ের একটা ভ্যান বের হয়ে এসেছে। ড্রাইভারের পাশে এখন নিষ্ঠুর চেহারার আরো একজন মানুষ বসে আছে।

নীরা এক্সেলটরে চাপ দিয়ে নিচু গলায় বলল, "বাপ্পী।"

"বল আম্মু।"

"আমি এখন তোকে যা বলব তুই মন দিয়ে শুনবি।"

নীরার গলার স্বরে কিছু একটা ছিলো যেটা শুনে বাপ্পীর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠে। সে শুকনো গলায় বলল, "শুনব আম্মু।"

"তোর কেভিনের কথা মনে আছে?"

"হ্যাঁ আম্মু।"

"মনে আছে কেউ একজন তাকে মেরেছিলো?"

"হ্যাঁ আম্মু।"

"তাকে কে মেরেছিলো জানিস?"

"কে আম্মু?"

"তুই।" নীরা কঠিন মুখে বলল, "তুই সেটা জানিস না কারণ কেউ একজন তোর উপর ভর করেছিলো।"

"ভর? ভর কেমন করে হয়?"

নীরা শীতল গলায় বলল, "বাপ্পী। তুই কোনো প্রশ্ন করিস না। শুধু শুনে যা। আমি যা যা বলব তুই তার সব কিছু বুঝবি না। না বুঝলে নাই, শুধু শুনে যা। ঠিক আছে?"

বাপ্পী ভয় পাওয়া গলায় বলল, "ঠিক আছে।"

"যেটা বলছিলাম। কেভিনকে মেরেছিলি তুই, কিন্তু তুই সেটা জানিস না কারণ খুব খারাপ একটা শক্তি তোর উপর ভর করেছিলো। তোর কোন দোষ নেই, তুই কিছু জানিস না। বুঝেছিস?"

বাপ্পী কিছুই বুঝলো না কিন্তু সে মাথা নেড়ে বলল, "বুঝেছি।"

"তোর ভেতরে যে খারাপ একটা শক্তি ভর করে সেটা দূর করতে হবে। তাহলে তুই স্বাভাবিক একটা মানুষ হয়ে যাবি। বুঝেছিস?"

"আমি এখন স্বাভাবিক মানুষ না?"

"তুই এখন স্বাভাবিক মানুষ– কিন্তু যখন তোর উপরে খারাপ একটা শক্তি ভর করে তখন তুই স্বাভাবিক মানুষ থাকিস না।"

"কিন্তু আম্মু–"

নীরা বলল, "এখন কোনো প্রশ্ন করিস না। শুধু শুনে যা।"

"ঠিক আছে আম্মু বল।"

নীরা গাড়ী চালাতে চালাতে রিয়ার ভিউ মিররের দিকে তাকালো, পিছনের ভ্যান গাড়ীটা খুব কাছে চলে এসেছে। মানুষটার একটা হাত বুকের কাছে জ্যাকেটের ভেতর, মনে হয় কিছু একটা অস্ত্র ধরে রেখেছে।"

নীরার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠলো, সে জোর করে নিজেকে শান্ত রেখে বলল, "পৃথিবীতে আমি শুধু একজন মানুষের কথা জানি যে তোকে ঠিক করে দিতে পারে। আমি তোকে তার কাছে নিয়ে যাব।"

"মানুষটা কোথায় থাকে আম্মু?"

"অনেক দূরে বাংলাদেশ নামে একটা দেশে। আমাদের প্লেনে করে যেতে হবে। কিন্তু–" নীরা বাক্যটা শেষ না করে থেমে গেল।

"কিন্তু কী আম্মু?"

"কিন্তু কাজটা খুব কঠিন।"

"কেন আম্মু? কাজটা কেন কঠিন?"

"তার কারণ কয়েকজন খুব খারাপ মানুষ আমাদেরকে বাংলাদেশে যেতে দিতে চায় না।"

"কেন যেতে দিতে চায় না আম্মু?"

"তারা চায় তোর ভেতরে যেন খারাপ শক্তিটা থাকে।"

"কেন আম্মু।"

নীরা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "সেটা তুই বুঝবি না। তারা সেই শক্তিটা ব্যবহার করতে চায়।"

বাপ্পী বড় মানুষের মতো মাথা নাড়ল, বলল, "বুঝেছি।"

"কী বুঝেছিস?"

"আমি মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি।"

"কী স্বপ্ন দেখিস?"

"একটা দানব আমার সাথে কথা বলে, বের হতে চায়। তখন আমার খুব ভয় লাগে। আমি তখন সারা রাত জেগে বসে থাকি।"

নীরা একটা নিঃশ্বাস ফেলল, বলল, "তুই যখন ভালো হয়ে যাবি তখন তুই আর ভয় পাবি না।"

নীরা হঠাৎ করে ডান দিকের একটা রাস্তায় ঘুরে শহরের সবচেয়ে ভয়ংকর এলাকার দিকে যেতে থাকে। এটি ডাউনটাউন এলাকা, দরিদ্র কালো মানুষের এলাকা। এটা নানা ধরনের গ্যাংদের এলাকা। ড্রাগস এর এলাকা। খুন খারাপীর এলাকা। সাধারণ কোনো মানুষ এখানে কখনো আসে না। পিছনের ভ্যানটি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলো না। সজোরে ব্রেক কষে থেমে যায়, তারপর পিছিয়ে গিয়ে আবার তার পিছু নিতে থাকে। রাস্তার দুই পাশে গ্রাফিতি আঁকা, মানুষজন কম। দিনের বেলাতেই কেমন যেন থমথমে একটা পরিবেশ। রাস্তার মোড়ে মাঝে মাঝে কয়েকজন ভয়ংকর দর্শন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি ক্রুর, মুখ পাথরের মতো কঠিন।

নীরা চোখের কোণা দিয়ে দুই পাশে দেখতে দেখতে বলল, "বাপ্পী, আমি এখন যে জায়গাটায় এসেছি এটা খুব ভয়ংকর একটা জায়গা। এখানে সব সময় গোলাগুলি হয়, এখন যদি কিছু হয় তুই ভয় পাবি না। ঠিক আছে?"

বাপ্পীর বুক কেঁপে উঠল, কিন্তু সে মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে। ভয় পাব না।"

"এখন থেকে তুই কোনো কথা বলবি না। শুধু দেখবি। ঠিক আছে?"

বাপ্পী মাথা নাড়ল এবং কী ঘটে সেটা দেখার জন্যে প্রস্তুত হলো।

নীরা কয়েকটা ব্লক ঘুরে একটা পাবের সামনে দাঁড়ালো, গাড়ীটা পার্কিং লটের রেখে সে বাপ্পীর হাত ধরে বলল, "আমার সাথে আয়।"

কাঠের একটা সিঁড়ি দিয়ে নীরা উপরে উঠে গিয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে। ভেতরে আবছা অন্ধকার, নিচু স্বরে জ্যাজ সঙ্গীত বাজছে। ভেতরে টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মানুষ জন বসে বিয়ার খাচ্ছে, সিগারেটের ধোয়ায় ঘরটা প্রায় অন্ধকার। যে মানুষগুলো বসে আছে তাদের প্রায় সবাই কালো, দুই একজন হিস্পানিক থাকতে পারে তবে আবছা আলোতে বোঝা যাচ্ছে না। নীরা বাপ্পীকে নিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে সবাই মাথা ঘুরে তাদের দিকে তাকালো। এরকম একটা জায়গায় একজন মহিলা যে একটা ছোট বাচ্চাকে নিয়ে ঢুকতে পারে সেটা কেউ বিশ্বাস করতে পারে না, কয়েক মুহূর্ত সবাই নিঃশব্দে বসে থাকে।

যে মানুষটি পানীয় ঢেলে দিচ্ছিল সে সবার আগে কথা বলল, "এইযে মেয়ে! তুমি একটা বাচ্চাকে নিয়ে এখানে ঢুকে গেছো? তোমার কী মাথা খারাপ নাকী অন্য সমস্যা আছে?"

নীরা বলল, "অন্য সমস্যা আছে।"

মানুষটি থতমত খেয়ে বলল, "তোমার সমস্যা আছে সেইটা তোমার ব্যাপার। তুমি এইখানে কেন এসেছ? তুমি জান এইটা কী এলাকা? এইখানে কারা আসে। কী করে?"

"জানি। সেই জন্যেই এসেছি।"

পাবের মাঝামাঝি বসে থাকা দৈত্যের মতো একজন কালো মানুষ হা হা করে হেসে উঠে বলল, "মেয়েটাকে আমার পছন্দ হয়েছে– কী সুন্দর করে কথা বলে!"

নীরা সবার দিকে তাকিয়ে বলল," আমার একটু সাহায্য দরকার। সেই জন্যে এসেছি। কে আমাকে সাহায্য করবে?"

ঘরের এক কোণায় বসে থাকা আধবুড়ো একজন মানুষ বলল, "এই মেয়ে! তোমার কী ধারণা এইখানে সান্তাক্লজ বসে আছে তোমাকে সাহায্য করার জন্যে?"

মানুষটির কথা শুনে অনেকেই হেসে উঠলো যেন এটা খুবই মজার একটা কথা।

নীরা বলল, "আমার যদি সান্তাক্লজ দরকার হতো তাহলে এইখানে আসতাম না। আমার দরকার একজন শক্ত মানুষ।"

পাবের যে মানুষটি পানীয় ঢেলে দেয় সে বিরক্ত হয়ে বলল, "এই মেয়ে! তুমি এখান থেকে বের হও। ঝামেলা করো না। এক্ষুণি বের হও। এখানে ঘোট পাকিও না।"

আরেকজন বলল, "একটা ছোট বাচ্চাকে নিয়ে পাবে ঢুকে পড়েছ? তোমার সাহস তো কম না।"

নীরা তাদের কথাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে আরো এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, "আমি কোনো ভূমিকা না করে বলে ফেলি। তোমাদের ভিতরে কেউ যদি আমাকে আর আমার এই বাচ্চাকে এয়ারপোর্টে একটা প্লেনে তুলে দিতে পার তাহলে আমি তাকে এক হাজার ডলার দিব।"

দৈত্যের মতো একজন বলল, "তুমি কী বেকুব, নাকী তোমার মাথা খারাপ?"

"কেন?"

"তুমি এই পাব থেকে বের হবে সাথে সাথে একটা পাংক তোমার এক হাজার ডলার কেড়ে নেবে।"

"কিন্তু তোমার মতো একজন যদি আমার সাথে থাকে তাহলে নিবে না। বল, কে আমাকে সাহায্য করবে?"

দৈত্যের মতো মানুষটা বলল, "তোমার সমস্যাটা কী?"

নীরা বলল, "কিছু মানুষ এই বাচ্চাটাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়।"

"পুলিশের কাছে কেন যাও না?"

"যেতে পারলে আমি তোমাদের কাছে আসি না।"

"বাচ্চাটাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছ?"

"না। আমার নিজের বাচ্চা–"

"আমি বিশ্বাস করি না। তুমি নিশ্চয়ই এই বাচ্চাটাকে কিডন্যাপ করেছ।"

তখন বাপ্পী হঠাৎ করে তার কচি গলায় বলল, "না। আমার আম্মু মোটেও আমাকে কিডন্যাপ করে নাই। আমি আমার আম্মুকে অসম্ভব ভালোবাসি।"

নীরা বাপ্পীর দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে বলল, "বাপ্পী! তোকে না কথা বলতে নিষেধ করেছি?"

"কিন্তু এই মানুষটা কেন বলেছে তুমি আমাকে কিডন্যাপ করেছ?"

"বলেছে তো বলেছে। তুই চুপ করে থাক।"

বাপ্পী চুপ করে গেলো। দৈত্যের মতো মানুষটা তখন উঠে দাঁড়াল, বলল, "ঠিক আছে আমি তোমাকে এয়ারপোর্ট পৌছে দিব। সত্যি এক হাজার ডলার দেবে তো?"

"হ্যাঁ দিব।"

"ক্যাশ? নগদ?"

"হ্যাঁ নগদ।"

মানুষটা হাত পাতলো, বলল, "দাও। অর্ধেক এখন, বাকী অর্ধেক এয়ার পোর্টে।"

"নীরা বলল, আমার কাছে এখন কোনো ডলার নেই। আগে ব্যাংকে যেতে হবে, টাকা তুলব আর সেফটি লকার থেকে আমার পাসপোর্ট তুলব।"

দৈত্যের মতো মানুষটা কিছুক্ষণ শীতল চোখে নীরার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর বলল, "মেয়ে! তুমি তো অনেক চালু!"

"আমি চালু নই। আমি বিপদগ্রস্ত, আমি আমার ছেলেটিকে বাঁচাতে চাই, তার বেশি কিছু না।"

"ঠিক আছে। চল। তোমার সাথে গাড়ী আছে?"

"আছে। কিন্তু–"

"কিন্তু কী?"

"আমার গাড়ীটা ছোট, তুমি আঁটবে বলে মনে হয় না।"

দৈত্যের মতো কালো মানুষটা হা হা করে হেসে বলল, "এই মেয়ে, আমার শরীরটা আঁটে সেইরকম গাড়ী এখনো তৈরি হয় নাই। তুমি চলো।"

দরজা দিয়ে বের হবার সময় নীরা বলল, "পার্কিং লটে সাদা ভ্যানটা দেখছ?"

"হ্যাঁ।"

"এই ভ্যানটা আমার পিছু নিয়েছে। দুইজন আছে, এরা অসম্ভব ডেঞ্জারাস।"

দৈত্যের মতো মানুষটার সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে বলে মনে হয় না, সে ঠোঁট দুটো সুঁচালো করে শিষ দিতে দিতে সাদা ভ্যানটার দিকে এগিয়ে যায়। ভ্যানের কাছে দাঁড়িয়ে দুই হাত বুকের উপর রেখে সে ভ্যানের ড্রাইভারের দিকে তাকালো,

বলল, "তোমরা সাদা মানুষেরা আমাদের কালো মানুষের এলাকায় এসেছ, ব্যাপারটা কী?"

ভ্যানের ড্রাইভারটাকে একটু শংকিত দেখায়, আমতা আমতা করে বলল, "না মানে-ইয়ে-"

দৈত্যের মতো মানুষটা বলল, "কাজটা ঠিক কর নাই। তোমরা অনেক বড় মস্তান কিন্তু সেই মাস্তানী করবে তোমার নিজের এলাকায়। এইটা আমার এলাকা, এইখানে তোমার মাস্তানী করার কথা না।"

"আমরা মাস্তানী করছি না।"

"তোমার পার্টনারকে জিজ্ঞেস করো তার ডান হাতটা জ্যাকেটের ভিতরে কেন? অস্ত্র ধরে রেখেছে? আমার এলাকায় সে হাতে অস্ত্র ধরে রাখবে?"

ড্রাইভার বলল, "না, মানে-"

"হাতটা বাইরে রাখতে বল। তা না হলে তোমার ড্যাশবোর্ডটা এই বেকুবের ঘিলু দিয়ে ময়লা হয়ে যাবে।"

নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটা সাবধানে তার হাতটা বাইরে নিয়ে আসে। দৈত্যের মতো মানুষটা বলল, "চমৎকার! এইবার আমার এলাকা থেকে বিদায় হও! তোমাদের পাঁচ সেকেন্ড সময় দিলাম।"

ভ্যানের ড্রাইভার নিচু গলায় তার পাশে বসে থাকা নিষ্ঠুর চেহারার মানুষটার সাথে কিছু একটা বলার চেষ্টা করতেই দৈত্যের মতো মানুষটা বিদ্যুৎ বেগে তার কোমরে গুঁজে রাখা বেঢপ একটা রিভলবার বের করে আনে, তারপর কিছু বোঝার আগেই সে গুলি করে ভ্যানের সামনের দুটি চাকা ফুটো করে দেয়। তারপর রিভলবারটা পিছনে গুঁজে রাখতে রাখতে বলল, "আমি তোমাদের বিদায় হতে বলেছিলাম। বিদায় হবার আগে শলা পরামর্শ করার পারমিশান দেই নাই? দিয়েছি?"

মানুষ দুইজন হতচকিত হয়ে দৈত্যের মতো কালো মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইল।

কালো মানুষটা বলল, "এখন তোমাদের একটু সমস্যা হলো। আমাদের এই এলাকায় আমরা সাদা রংয়ের মানুষ পছন্দ করি না। যদি জান নিয়ে বের হতে পারো বুঝবে তোমাদের উপর বাবা মায়ের দোয়া আছে। আর যদি না পার আমার উপর রাগ পুষে রেখো না। তোমরা সাদা চামড়ার শুওরের বাচ্চারা আমাদের উপর অনেক অত্যাচার করেছ- আমরা না হয় একটু আধটু করলাম।"

দৈত্যের মতো কালো মানুষটা হা হা করে হাসতে হাসতে নীরার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, "চল মেয়ে আমরা যাই। এরা এখন তোমাকে কোনো ঝামেলা করবে না।"

বাপ্পী এক ধরনের শ্রদ্ধা মেশানো বিস্ময় নিয়ে দৈত্যের মতোন কালো মানুষটার দিকে তাকিয়ে ছিলো। মানুষটা বাপ্পীর দিকে চোখ টিপে বলল, "কী নাম তোমার ওস্তাদ।"

বাপ্পী বলল, "আম্মু আমাকে কথা বলতে নিষেধ করেছে।"

"নাম বলতে কোনো সমস্যা নাই। আমার নাম বিলি। বিলি রাক্ষস।"

বাপ্পী মুখ শক্ত করে বলল, "রাক্ষস কখনো মানুষের নাম হয় না।"

বিলি নিজের শরীরটা দেখিয়ে বলল, "আমার এই রাক্ষসের মতো শরীরটা দেখছ না? এই জন্যে বলে বিলি রাক্ষস।"

বাপ্পী কোনো কথা না বলে সন্দেহের চোখে বিলির দিকে তাকিয়ে রইল। বিলি বলল, "তোমার নামটা বল ওস্তাদ। তাহলে আমি তোমাকে আমার খেলনাটা দিয়ে খেলতে দিব।" বলে সে কাপড় তুলে কোমরে গোঁজা রিভলবারটা দেখালো।

এবার উত্তেজনায় বাপ্পীর চোখ দুটো চকচক করে উঠে, বলে, "সত্যি?"

বাপ্পী এবারে নীরার দিকে তাকিয়ে বলল, "আম্মু! আমি একটু খেলতে পারি?"

নীরা চোখ পাকিয়ে বলল, "তোকে এই খেলনা দিয়ে খেলতে হবে না। গাড়ীতে উঠে বস।"

বাপ্পী মন খারাপ করে গাড়ীতে উঠে বসে, এবার সে বসল পিছনের সিটে। নীরার পাশে বসলো বিলি, ছোট সিটে তাকে রীতিমতো কষ্ট করে বসতে হলো।

নীরা গাড়ী ছাড়তে ছাড়তে বলল, "থ্যাংকস বিলি।"

"কোনো সমস্যা নেই মেয়ে। গাড়ী চালাও।"

"আমার নাম নীরা।"

বিলি তার হাতটা নীরার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশী হলাম নীরা।"

নীরা তার হাত স্পর্শ করে বলল, "আমিও খুশী হলাম।"

বাপ্পী পিছন থেকে বলল, "আমার নাম বাপ্পী।"

বিলি তার থাম্বার মতো বিশাল হাতটা বাপ্পীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশী হলাম ওস্তাদ।"

বাপ্পী হি হি করে হেসে বলল, "আমি মোটেও ওস্তাদ না। আমি বাপ্পী।"

বোর্ডিং কার্ড হাতে নিয়ে নীরা এগিয়ে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। সে তার ব্যাগ থেকে একশ ডলারের বেশ কয়েকটা নোট বের করে একটা খামে ভরে বিলির দিকে এগিয়ে দিলো, বলল, "বিলি, তুমি সাহায্য না করলে আমরা যেতে পরতাম না।"

"তোমার যাত্রা শুভ হোক।"

নীরা খামটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই যে এইখানে তোমার বাকী টাকা।"

বিলি খামটা হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর নিজের পকেট থেকে আগে নেয়া ডলারের নোটগুলো বের করে খামটার ভেতরে ভরে নীরার দিকে এগিয়ে দেয়।

নীরা অবাক হয়ে বলল, "কী হলো?"

"নাও তোমার সাথে রাখো।"

"তোমার সাথে আমার এক হাজার ডলারের কন্ট্রাক্ট হয়েছিলো।"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমার থেকে তোমার এই টাকাগুলো বেশি দরকার। তোমার আর তোমার ছেলের কী সমস্যা অমি জানি না– কিন্তু যে সমস্যাই হোক হাতে একটু টাকা থাকলে সুবিধা হয়!"

"বিলি, আমি ম্যানেজ করে নিতে পারব। নাও তোমার টাকা।"

"না। আমার লাগবে না। তোমার বিপদে আমি তোমাদের সাহায্য করতে পেরেছি এইটাই আমার আনন্দ। যাও, ঢুকে যাও ভিতরে।"

নীরা বাপ্পীর হাত ধরে প্লেনের গেটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলো দৈত্যের মতো বিশাল এবং কুচকুচে কালো বিলি দুই হাত বুকের ওপর রেখে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

বাপ্পী হাত নেড়ে বলল, "বাই বিলি চাচা!"

বিলি স্যালুটের মতো করে হাত কপালে ছুঁয়ে বলল, "বাই ওস্তাদ!"

চৈতীর ডান হাতটা স্লিং দিয়ে ঘাড় থেকে ঝুলছে। কপালের কাছে একটা কাটা দাগ। চৈতী তার ব্যাগটা সিটের নিচে রেখে তার চেয়ারে বসলো। তার পাশে একজন মা তার ফুটফুটে একটা সন্তানকে নিয়ে বসেছে। মা'টি নীরা এবং

সন্তানটি বাপ্পী।

নীরা চৈতীকে ভালো করে বসার সুযোগ করে দিয়ে বলল, "কোথায় যাবেন? ঢাকা?"

চৈতী বলল, "হ্যাঁ।"

নীরা একটু হাসার ভঙ্গী করে বলল, "আমরাও ঢাকা যাচ্ছি।'

চৈতী মাথা নেড়ে বলল, "ও আচ্ছা।"

ছোট বাচ্চাটি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলো, উত্তেজনায় তার চোখ দুটি চক চক করছে। সে বলল, "আম্মু দেখো ইঞ্জিনটা কতো বড়।"

নীরা না দেখেই বলল, "হ্যাঁ বাপ্পী। অনেক বড়।" তারপর চৈতীর দিকে তাকিয়ে বলল, "প্রথমবার প্লেনে উঠেছে তাই উত্তেজনার শেষ নেই।"

চৈতী বলল, "ওকে দোষ দেবেন কেমন করে? আমারও উত্তেজনা হয়। এতো বড় একটা প্লেন আকাশে উড়ে চিন্তা করে আমি এখনো অবাক হয়ে যাই।"

নীরা চৈতীর দিকে তাকিয়ে বলল, "হাতে কী হয়েছে?"

চৈতী বলল, "মচকে গিয়েছে। বাথটবে থেকে নামছিলাম হঠাৎ করে পা পিছলে গেলো। কপালটাও কেটে গেছে।"

নীরা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল, বলল, "হ্যাঁ। বাথটাব জিনিষটা আমি দুচোখে দেখতে পারি না। খুবই বিপদজনক একটা বিষয়।"

চৈতী জোর করে হাসার একটু চেষ্টা করল। সে আসলে বাথটাবে পিছলে পড়ে হাতে ব্যথা পায় নি, কপাল কেটে যায় নি। চৈতীর স্বামী আকরাম মেরে তার এই অবস্থা করেছে। সেই ছয় বছর আগে তার বিয়ে হয়েছিলো। বিয়ের পর মানুষটির আসল চেহারা প্রকাশ পেতে খুব বেশি দেরি হয় নি। বিয়ে করে এই দেশে আসার কিছুদিনের ভিতরেই চৈতী বুঝতে পেরেছিলো তার স্বামী আকরাম আসলে একজন ভালো মানুষ নয়। মানুষটি হিংসুটে এবং বদমেজাজী। কীভাবে কীভাবে সে জেনে গিয়েছিলো বিয়ের আগে তার রাজুর সাথে একটা সম্পর্ক ছিলো এবং সেটা নিয়ে আকরামের ভেতরে প্রচণ্ড একটা জেলাসী কাজ করেছে। ব্যাপারটাকে কখনোই মেনে নেয়নি এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সে এটা নিয়ে তাকে খোটা দিয়েছে।

চৈতী অনেক কষ্ঠ করে সহ্য করার চেষ্টা করেছে। লেখাপড়া শেষ করেছে। একটা ফার্মে চাকরী নিয়েছে এবং যখন সে মাসে মাসে বেতন পেয়ে নিজের পায়ে

দাঁড়াতে পেরেছে তখন সে শেষ পর্যন্ত আকরামের দুর্ব্যহারের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছে। তার ফল হয়েছে ভয়ানক এবং আকরাম তখন দুর্ব্যবহারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ঝগড়ার একটা মুহূর্তে আকরাম প্রথমবার যখন চৈতীর গায়ে হাত তুললো, ঠিক তখনই চৈতী বুঝতে পেরেছিলো এই মানুষটার সাথে তার ঘর করা সম্ভব হবে না। তখন তখনই চৈতী তার ছোট ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। আকরাম পথ আটকে বলল, "কোথায় যাচ্ছ?"

চৈতী বলল, "চলে যাচ্ছি। তোমার সাথে আমার থাকা সম্ভব না।"

"কোথায় থাকবে?"

"আমার থাকার জায়গা নিয়ে সমস্যা হবে না। যে মানুষ গায়ে হাত তুলতে পারে আমার পক্ষে তার সাথে ঘর করা সম্ভব না।"

আকরাম তখন মুখ কাচুমাচু করে বলেছিলো, "আই এম সরি চৈতী, রেগে গেলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। আর কখনো হবে না।"

চৈতী শীতল চোখে বলেছিলো, "আমি সেটা বিশ্বাস করি না। যে একবার তার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে পারে সে আরো অনেকবারই পারে।"

"আসলে একটু ড্রিংক করেছিলাম। ড্রিংক করলেই আমার মাথাটা গরম হয়ে উঠে।"

"আমি জানি। তুমি যখন মাতাল হও তখন তোমাকে মানুষের মতো দেখায় না।"

"ঠিক মাতাল নয়, শুধু একটু টিপসি–"

"না। টিপসি নয়। মাতাল। পৃথিবীতে আমি দুটো জিনিষকে খুব ঘেন্না করি। একটা হচ্ছে সাপ, আরেকটা হচ্ছে মাতাল। তুমি সরে যাও, আমি যাব। তোমার সাথে আমার ঘর করা সম্ভব নয়।"

আকরাম তখন একেবার কাচুমাচু হয়ে বলেছিলো, "প্লীজ চৈতী। তুমি চলে যেও না। আমি কথা দিচ্ছি আমি আর কখনো তোমার গায়ে হাত তুলব না। তোমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি।"

চৈতী বলেছিলো, "তোমার সেটা আগে চিন্তা করা দরকার ছিলো। এখন দেরী হয়ে গেছে, পথ ছাড়ো। আমি যাব।"

আকরাম তখন ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কাঁদতে শুরু করলো। মাতাল মানুষের কান্নার মতো নোংরা জিনিষ আর কিছু হতে পারে না, সেই দৃশ্য দেখে চৈতীর

ঘেন্নায় বমি হয়ে যাবার মতো অবস্থা হলো। সে আকরামকে ঠেলে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলো।

সেই রাতটা সে ছিলো তার এক বন্ধুর বাসায়। পরের দিন একটা এপার্টমেন্ট ভাড়া করে সে আলাদা থাকতে শুরু করেছিলো। আকরাম এরকম কিছু আশা করে নি। সে দুর্বল চরিত্রের মানুষ। চৈতী এভাবে এক কথায় ঘর থেকে বের হয়ে যাবে সে কখনো চিন্তা করে নি। প্রায় প্রতিদিন চৈতীর করছে গিয়ে মাপ চাইতো আর কখনো এরকম হবে না বলে প্রতিজ্ঞা করতো।

চৈতী শেষ পর্যন্ত আবার আকরামের কাছে ফিরে এসেছিলো। আবার নূতন করে সংসার করার চেষ্টা করেছিলো। তবে আকরামের জন্যে সম্মান বোধটা চলে যাওয়ার কারণে কখনোই সম্পর্কটা ঠিক ভাবে গড়ে উঠে নি।

চৈতীর তখন একটা সন্তানের জন্যে খুব আকাঙ্ক্ষা হলো, সে ভাবলো একটি দুটি ফুটফুটে বাচ্চাকে নিয়ে সে তার নিজের মতো করে একটা জীবন তৈরি করবে। বছর খানেক চেষ্টা করার পরও যখন কোনো সন্তান হলো না তখন ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হলো– খুব বেশি পরীক্ষা করার প্রয়োজন হলো না, প্রথম দিকেই ধরা পড়লো আকরামের বড় ধরনের সমস্যা রয়েছে। ব্যাপারটার খটমটে একটা ডাক্তারী নাম রয়েছে, সোজা ভাষায় তার বাবা হবার ক্ষমতা নেই। খুব লাভ হবে না জেনেও নানা রকম ওষুধ পত্র ছাড়াও ইন ভিট্রো ফারটিলাইজেশানের চেষ্টা করা হলো, কিন্তু চৈতী শেষ পর্যন্ত নিঃসন্তানই থেকে গেলো।

চৈতী শেষের দিকে আকরামকে বোঝানোর চেষ্টা করলো যে তারা একটা বাচ্চাকে পালক নেবে কিন্তু আকরাম কিছুতেই রাজী হলো না। কথাটি তুললেই সে বলতো, "কার না কার বাচ্চা, কী না কী হবে।"

চৈতী বলতো, "কী না কী হবে মানে? একটা ছোট বাচ্চাকে তুমি যেভাবে মানুষ করবে সে তাই হবে।"

আকরাম চৈতীর কথা শুনতো না। মাথা নেড়ে বলতো, "অজাত কুজাত বজ্জাত বাচ্চা ঘরে আনার কোনো দরকার নাই।"

কাজেই চৈতীর বুকের ভেতরটা ফাঁকাই থেকে গেলো। সে কখনোই চিন্তা করে নি তার এরকম একটা জীবন হবে, কিন্তু সত্যি সত্যি তার ভয়ঙ্কর নিরানন্দ

একটা জীবনের শুরু হলো। একটার পর একটা দিন সে পার করে দেয়, সেই দিনগুলোর জন্যে সে আর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে না।

হয়তো এভাবেই তার বাকী জীবনটা কেটে যেতো কিন্তু এর মাঝে সম্পূর্ণ নূতন একটা সমীকরণের জন্ম হলো। চৈতী একদিন আবিষ্কার করল আকরাম তার অফিসের একজন মহিলা সহকর্মীর সাথে মাখামাখি শুরু করেছে। ব্যাপারটা যখন একটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছে গেলো তখন একদিন চৈতী আকরামকে ডেকে বলল, "আকরাম, তোমার সাথে একটা কথা আছে।"

আকরাম সাথে সাথে তার মুখ শক্ত করে বলে, "কী কথা?"

"তুমি জান, আমি কী কথা বলতে চাইছি।"

আকরাম মাথা নাড়ল, বলল, "না জানি না।"

চৈতী বলল, "তুমি তোমার অফিসের মেয়েটার সাথে যেসব ব্যাপার করছ সেটা ভালো দেখাচ্ছে না।"

আকরাম গলা উঁচু করে চিৎকার দিয়ে বলল, "তুমি কী সব আজেবাজে কথা বল? তোমার মন এতো নোংরা, এতো কুৎসিত–"

চৈতী বলল, "আমার মনের কোনো সমস্যা নেই। সত্যি কথা বলতে কী তোমার উপর আমার শ্রদ্ধাভক্তি বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। তুমি কী করো না করো তাতে আমার কিছু আসে যায় না। নেহায়েত স্বামী স্ত্রী হিসেবে আছি, আমার ধারণা একটু চক্ষু লজ্জা থাকা ভালো।"

আকরাম গলার রগ ফুলিয়ে চিৎকার করে বলল, "তুমি কী বলতে চাও? এতোই যদি তোমার মান সম্মান তাহলে তুমি ডিভোর্স দিয়ে বিদায় হও না কেন? কে তোমাকে আটকে রেখেছে?"

চৈতী আহত চোখে আকরামের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি চার বছর আগে একদিন বিদায় হতে চেয়েছিলাম, তখন তুমি প্রায় পা ধরেই আমাকে ফিরিয়ে এনেছিলে! আমি আবার বিদায় হয়ে যাব– তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই।"

"বিদায় হয়ে তুমি যাবে কোথায়?"

চৈতী নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এই বারে দেশে চলে যাব।"

"দেশে?" আকরাম হা হা করে হেসে বলল, "দেশে কার কাছে? তোমার সেই রাজু ছোড়ার কাছে?"

চৈতী কোনো কথা না বলে আকরামের দিকে শীতল চোখে তাকিয়ে রইল। আকরাম তার হাসি না থামিয়ে বলল, "খোঁজ নিয়ে দেখো তোমার এই রাজু ছোড়া প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী করছে! আরেকটা মাস্টারনীকে বিয়ে করে বছর বছর বাচ্চা পয়দা করছে। তার কাছে তোমার কোনো জায়গা হবে না।"

একজন মানুষ কুৎসিত একটা মাকড়শা কিংবা ঘিনঘিনে একটা সাপের দিকে যেভাবে তাকায় চৈতী সেভাবে আকরামের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলো। তাদের কথাবার্ত্তা সেদিন থেকে মোটামুটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

এরপর আকরাম দেখতে দেখতে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠতে থাকে। চৈতীও বুঝে যায় সে আর আকরামের সাথে থাকতে পারবে না। কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ করে তার দেশে ফিরে আসার জন্যে বুকের ভেতর খা খা করতে থাকে। সে একজন ডিভোর্স লয়ারের সাথে কথা বলল, কাগজপত্র তৈরি করল তারপর একদিন আকরামের সাথে কথা বলতে গেলো, বলল, "আকরাম! তোমার সাথে কথা বলতে এসেছি।"

আকরাম ভুরু কুঁচকে বলল, "আমার সাথে? আমার সাথে কী কথা?"

"আমি যাচ্ছি আকরাম।"

"তুমি যাচ্ছ? কোথায় যাচ্ছ?"

"দেশে।"

"দেশে? দেশে কার কাছে?"

"কারো কাছে না। দেশের মানুষ দেশে ফিরে যাচ্ছি।"

"আমি কিছু জানি না শুনি না–"

চৈতী শান্ত গলায় বলল, "তুমি সব কিছু জানবে শুনবে সেরকম সময় পার হয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি– আর কোনোদিন হয়তো তোমার সাথে দেখা নাও হতে পারে।"

"মানে?"

"আমি ডিভোর্সের কাগজপত্র রেডি করেছি। তোমার হয়তো এক দুই জায়গায় সিগনেচার করতে হতে পারে। করে দিও।"

হঠাৎ করে আকরাম কেমন জানি খেপে উঠলো। মুখ খিঁচিয়ে গলা উঁচিয়ে বলল, "কথা নেই বার্তা নেই তুমি ঘুম থেকে উঠে বল ডিভোর্স! তোমার সাহস তো কম না!"

"এটা সাহসের ব্যাপার না। এটা হচ্ছে–"

আকরাম গলার রগ ফুলিয়ে বলল, "ও! নাগরের কাছে ফিরে যাচ্ছ? রসের নাগর–"

চৈতী শীতল গলায় বলল, "মুখ সামলে কথা বল আকরাম। কে কার রসের নাগর সেটা জানতে কারো বাকী নেই।"

"চুপ করো তুমি চুপ করো–" বলে হঠাৎ করে আকরাম লাফিয়ে উঠে চৈতীকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দেয়। টেবিলের কোণায় মাথা লেগে চৈতীর কপালটা কেটে যায়। আকরাম খ্যাপার মতো চৈতীর দিকে এগিয়ে গেলো লাথি মেরে একটা টেবিল ল্যাম্প ভেঙ্গে ফেলে, ধাক্কা মেরে একটা বইয়ের শেলফ চৈতীর উপর ফেলে দেয়।

সময় মতো সরে গিয়ে চৈতী কোনোমতে নিজেকে রক্ষা করে তারপরেও বাম হতটায় খুব খারাপ ভাবে চোট খায় চৈতী। আকরাম আরো কী করতো চৈতী ঠিক করে জানে না– কিন্তু ব্যাপারটা বেশি দূর গড়ালো না পুলিশের কারণে। পাশের ফ্লাট থেকে একজন পুলিশকে খবর দিয়েছিলো– তারা চৈতীকে হাসপাতালে আর আকরামকে থানায় নিয়ে গেলো।

চৈতী হাসপতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আর দেরি করল না, প্লেনের টিকেট কিনে একদিন সে প্লেনে চেপে বসল। প্লেনে নিজের সিটে বসে তার বহুদিন পরে রাজুর কথা মনে পড়ল। রাজু তাকে বলেছিলো, চৈতী, তোর যদি কখনো আমাকে দরকার হয় বলিস। আমি তোর জন্যে অপেক্ষা করব। সত্যিই কী রাজু তার জন্যে অপেক্ষা করছে?

ঠিক পাশের সিটে সেই মুহূর্তে নীরাও রাজুর কথা ভাবছিলো। বাংলাদেশে কোটি কোটি মানুষের ভেতর থেকে সে কী রাজুকে খুঁজে বের করতে পারবে? যদি বের করতে না পারে তাহলে কী হবে? নীরা বুকের ভেতর চাপা একটা দুর্ভাবনা নিয়ে বাপ্পীকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে।

প্লেনটা যখন আটলান্টিকের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ করে প্লেনের ভেতর একটা মৃদু ঝাকুনী শুরু হয়। কেবিনের ভেতর পাইলটের সতর্ক গলার স্বর শোনা গেলো, পাইলট বলল যে সামনে টার্বুলেন্ট এলাকা, প্যাসেঞ্জারদের নিজ নিজ সিটে সিট বেল্ট বেঁধে বসে থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। দেখতে দেখতে বিশাল প্লেনটা সেই বিক্ষুব্ধ এলাকায় ঢুকে পড়ে, প্লেনটা ঝাকুনি খেয়ে উপরে নিচে

করতে থাকে। বিশাল প্লেনটা মচ্ মচ্ শব্দ করতে থাকে যেন অদৃশ্য কোনো একটা শক্তি পুরো প্লেনটাকে টুকরো টুকরো করে দেবে।

বাপ্পী জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলো, জোছনার ম্লান আলোতে প্লেনের বিশাল পাখাটা থরথর করে কাঁপতে দেখা যায়। সে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে নীরার দিকে ঘুরে তাকালো, বলল, "আম্মু! দেখো দেখো!"

"কী দেখব?"

"প্লেনের পাখাটার দিকে তাকাও!"

নীরা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো।

বাপ্পী বলল, "দেখেছো আম্মু?"

"কী দেখব?"

"প্লেনের পাখার উপরে ঐ মানুষটাকে দেখেছ?"

"প্লেনের পাখার উপরে মানুষ?"

"হ্যাঁ! দেখো কীভাবে চিৎকার করছে–"

নীরা কিছু দেখতে পেলো না, সে বাপ্পীর দিকে তাকালো। বাপ্পী দেখছে, তার চোখে মুখে বিস্ময়। সে নীরার দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখো আম্মু! মানুষটা কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে প্লেনের পাখাটা ভাঙ্গার চেষ্টা করছে!"

প্লেনের পাখাটা লটপট করে নড়তে থাকে, নীরার মনে হয় সত্যি বুঝি ওটা ভেঙ্গে উড়ে যাবে। বাপ্পী এক ধরনের আতংক নিয়ে মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকে, ফিসফিস করে বলে, "দেখেছ আম্মু– মানুষটার শরীরে কোনো কাপড় নাই, গায়ে কতো বড় লোম! বাতাসে মনে হয় মানুষটা উড়ে যাবে– দেখেছো, কীভাবে চিৎকার করছে!"

ঠিক তখন একটা বিদ্যুৎ ঝলক প্লেনটাকে আঘাত করল, সমস্ত প্লেনটা প্রবল ভাবে কেঁপে উঠে, মনে হয় ঘুরপাক খেয়ে পড়ে যাবে নিচে। প্লেনের ভেতরটা হঠাৎ করে অন্ধকার হয়ে যায়। প্যাসেঞ্জারদের এক ধরনের আতংকের চিৎকার শোনা যায়। প্রায় সাথে সাথে পাইলটের শান্ত গলার স্বর শোনা গেলো, "প্রিয় যাত্রী বৃন্দ, আপনাদের আতংকিত হবার কিছু নেই আমাদের বিমানটিকে একটি বজ্রপাত আঘাত করেছে, সাময়িক ভাবে আমরা কেবিনে বৈদ্যুতিক সংযোগ হারিয়েছি। আমরা বৈদ্যুতিক যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা করছি, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা না বলছি কেউ সিট বেল্ট খুলবেন না।"

প্যাসেঞ্জাররা শান্ত মুখে কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করতে থাকে।

ভোর রাতে প্লেনটা হিথ্রো বিমানবন্দরে ল্যান্ড করে। বিশাল জেট বিমানটি যখন ধীরে ধীরে টার্মিনালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন আবার পাইলটের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, পাইলট বলল, "প্রিয় যাত্রী বৃন্দ, গত রাতের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় আমরা ছোটখাটো একটা বিপর্যয়ের মাঝে পড়েছিলাম। আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন, কোনো একটি অজ্ঞাত কারণে বিমানের ডান পাখাটি খনিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা বড় কোনো ঝামেলা ছাড়াই নিরাপদে ল্যান্ড করেছি। আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।"

নীরা জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়, প্লেনের পাখাটা যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বাপ্পী ঠিক সেখানেই গত রাত্রে তাকিয়ে ছিল, ঠিক সেখানেই সে একটা মানুষকে দেখেছিলে।

নীরা নিজে ভেতরে আতংকের একটা কাঁপুনী অনুভব করে। তাদের পিছু নিয়েছে কোনো একটা অশুভ শক্তি। সে টের পায়, আশে পাশেই আছে তারা। সব সময়েই আছে।

রাজু নদীর তীরে উঁচু বাধটা ধরে হাঁটছিলো, দূরে মানুষজনের একটু ভীড় দেখে সে থমকে দাঁড়ালো। দূর থেকে খানিকক্ষণ সে মানুষজনের ভীড় আর উত্তেজনাটুকু লক্ষ করে তারপর একটু এগিয়ে যায়। একজন বৃদ্ধা মহিলা মাথায় হাত দিয়ে হাউ মাউ করে কাঁদছে, তাকে ঘিরে মানুষজনের ভীড়। রাজু আরেকটু এগিয়ে গেল। তাকে দেখে কয়েকজন সরে গিয়ে একটু জায়গা করে দেয়। রাজু জিজ্ঞেস করলো, "কী হয়েছে?"

"জাহেদাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"জাহেদা? জাহেদা কে?"

"নসিমন খালার মেয়ে।"

"কেমন করে হারাল?"

"রাত্রেবেলা বাথরুম করতে বের হয়েছিলো আর ফিরে আসে নাই।"

রাজুর বুকটা ধ্বক করে উঠে, কমবয়সী মেয়ে রাত্রি বেলা ঘর থেকে বের হয়েছে আর ফিরে আসে নি, এর অর্থ একটাই হতে পারে। দুর্ভাগা মেয়েটি কারো লালসার শিকার হয়েছে। রাজু আরেকটু এগিয়ে বৃদ্ধাকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলো তখন হঠাৎ বৃদ্ধা উঠে দাঁড়িয়ে একজনের দিকে প্রায় ছুটে যায়, হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে, "তুই! তুই-তুই-গহর—"

গহর নামের মানুষটি হতচকিতের মতো দাঁড়িয়ে বলে, "কী হয়েছে?"

বৃদ্ধা চিৎকার করে বলল, "বল, আমার জাহেদা কোথায়। বল।"

"আমি কেমন করে বলব?"

"তুই আমার জাহেদাকে কু প্রস্তাব দিয়েছিলি— তুই—"

গহর মুখ ভেংচে বলল, "আমি কুপ্রস্তাব দিয়েছি? তোর ঐ ছিনাল মেয়েকে আমি কুপ্রস্তাব দিব? খোঁজ নিয়ে দেখ কার সাথে পালিয়েছে!"

বৃদ্ধা হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমার জাহেদা আমাকে ছেড়ে যাবে না। যাবে না—"

গহর নামের মানুষটা মুখটা বিকৃত করে একটু থুতু ফেলে হেঁটে চলে যেতে শুরু করে। রাজু একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়েছিলো, হঠাৎ করে সে কমবয়সী একটা মেয়ের মুখ দেখতে পায়, আর্তনাদ করছে। তার গলায় ওড়না দিয়ে লাগানো ফাঁস। ফাঁস ধরে টানছে দুটি হাত। হাতে বড় বড় লোম, বাম হাতের অনামিকায় একটা বড় পাথর লাগানো আংটি।

গহর হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছিল রাজু তখন তাকে ডাকলো। বলল, "এই যে। শুনেন।"

গহর ঘুরে দাঁড়াল, বলল, "কী?"

"আপনার হাত দুটো দেখি।"

গহর অবাক হয়ে বলল, "কী দেখবেন?"

"হাত।"

"কেন?"

"এমনি—"

গহর তার হাত দুটো মেলে ধরে। হাতে বড়বড় লোম, বাম হাতের অনামিকায় একটা বড় পাথরের আংটি।

রাজু দুই পা এগিয়ে গহরের হাতটা ধরে। সাথে সাথে রাজু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো চমকে উঠলো, একটা মেয়ের আর্ত কান্না তার সাথে কয়েকজন পুরুষ মানুষের ক্রুদ্ধ চিৎকার শুনতে পেল সে। রাজু চোখ মেলে তাকায়, আবছা আবছা ভাবে দেখতে পায় দুইজন মানুষ মেয়েটিকে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, একজন গহর। অন্যজনের সামনে দুটি দাঁত নেই। ছাড়া ছাড়া কিছু দৃশ্য ভেসে আসে। একটা ডোবার নিচে মাটি কুপিয়ে মেয়েটার শরীর পুঁতে দিচ্ছে। উপরে ঝাকড়া একটা হিজল গাছ, বাজারে বসে বাংলা মদ খেতে খেতে হা হা করে হাসছে গহর আর দাঁত নেই মানুষটি।

রাজু হাতটা ছেড়ে দিল। সাথে সাথে সবগুলো দৃশ্য মিলিয়ে গেলো। রাজু বুঝতে পারল, তার হাত অল্প অল্প কাঁপছে। সে জিব দিয়ে তার ঠোঁটগুলো ভিজিয়ে গহরের চোখের দিকে তাকালো, গহরের চোখে এখন আতংকিত একটা দৃষ্টি। ভীরু কাপুরুষের আতংক। রাজু ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, "দাঁত ভাঙ্গা মানুষটা কে?"

গহরের মুখ মুহূর্তে রক্ত শূন্য হয়ে যায়। শুকনো গলায় বলে, "কার কথা বলছেন?"

"যার সামনে দুটি দাঁত নাই। বাজারে যার সাথে কাল রাতে বাংলা মদ খেয়েছো?"

"আমি–আমি–"

রাজু আবার খপ করে মানুষটার হাত দুটো ধরে ফেলে, সাথে সাথে মানুষটা একটা যন্ত্রণার মতো শব্দ করল। রাজু ফিস ফিস করে বলল, "আমার চোখের দিকে তাকাও গহর।"

গহর মুখ বিকৃত করে মাথা নাড়ে, বলে, "না।"

"তাকাও আমার চোখের দিকে– সত্য কথা বল।"

গহর হঠাৎ হাঁটু ভেঙ্গে নিচে পড়ে গেলো। মাথা নিচু করে বলল, "আমি না! আক্কাস– আক্কাস আমারে বলল–"

চারপাশের মানুষ হঠাৎ ভীড় করে এগিয়ে আসে, একজন খপ করে গহরের চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে দাঁড় করিয়ে ধাক্কা দিয়ে পিছনে সরিয়ে দেয়। গহর রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখে ভাঙ্গা গলায় বলল, "আমি চাই নাই। আমি খুন করতে চাই নাই– শুওরের বাচ্চা আক্কাস বলল–"

আক্কাস কী বলল, সেটা রাজু ভালো করে শুনতে পেলে না– অসংখ্য ক্রুদ্ধ মানুষের চিৎকারে সেটা চাপা পড়ে গেলো। রাজু পিছিয়ে আসে তারপর আস্তে আস্তে নদীর তীরের দিকে এগিয়ে যায়। সে যখন কিছু দূর এগিয়েছে তখন পিছন থেকে কে যেন তাকে ডাকলো, "রাজু ভাই। ও রাজু ভাই–"

রাজু পিছন ফিরে তাকালো, এই গ্রামের সতেরো আঠারো বছরের একটা ছেলে। রাজুর কাছে এসে সে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর নিচু গলায় বলল, "আপনি কেমন করে করলেন?"

"কী করলাম?"

"গহর হারামজাহাদাকে দিয়ে সত্যি কথা বলালেন?"

রাজু অস্বস্তি অনুভব করে, সে কখনোই কাউকে বলতে পারবে না যে সে পুরো দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখেতে পেয়েছে। কেউ বিশ্বাস করবে না। যদি বিশ্বাস করে সেটা হবে আরো বিপজ্জনক তখন কেউ তাকে আর স্বাভাবিক ভাবে নেবে না। তাই সে প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল, বলল, "অপরাধী মানুষ, মন নিশ্চয়ই দুর্বল। চাপ দিতেই স্বীকার করে ফেলল।"

ছেলেটি মাথা নাড়ল, বলল, "না রাজু ভাই। গহর শুওরের বাচ্চার মন কখনো দুর্বল হয় না। অন্য ব্যাপার আছে।"

রাজু জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?"

"অন্য ব্যাপার। যেটা আপনি জানেন, আর কেউ জানে না।"

রাজু মাথা নাড়ল, বলল, "আমি কিছু জানি না।" তারপর অনির্দিষ্টের মতো নদীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি যাও। দেখো, পুলিশে খবর দেও। পুলিশ আসার পর গহরকে দিয়ে ডেডবডি উদ্ধার করাও। দাঁতভাঙ্গা মানুষটা যেন পালাতে না পারে। সেইটাও দেখো।"

"দেখব রাজু ভাই।"

"এরা কিন্তু মানুষ ভালো না।"

"জানি।"

"আর বুড়ী মানুষটার কাছে থেকো, একটু সাহস দিও। শান্তনা দিও।"

রাজু নদীর তীর ধরে হাঁটতে থাকে, দেখতে দেখতে এই এলাকাটাতে তার তিন বছর হয়ে গেলো। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী শেষ করে সে যখন চাকরির

ইন্টারভিউ দিচ্ছে তখন ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ে এই পুরো এলাকাটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। ঢাকা থেকে তখন একটা দল নিয়ে সে এখানে রিলিফ দিতে এসেছিলো, তারপর আর যাওয়া হয় নি। প্রতি বছরই সে ভাবে এখন ফিরে যাবে, আর ফিরে যাওয়া হয় না। উপকূল এলাকায় থাকতে থাকতে সে এখন তাদের একজন মানুষ হয়ে গেছে। গ্রামে কোনো স্কুল ছিলো না, সে একটা স্কুল তৈরি করেছে– বাচ্চাদের পড়ানোর ব্যবস্থা করেছে। একটা এন.জি.ও স্কুল ঘরটা তৈরি করে দিয়েছে সেখানে ছোট ছোট বাচ্চারা চেচামেচি করে লেখাপড়া করে, রাজুর ভালোই লাগে। তার বই পড়ার অভ্যাসটি একটুও কমে নি, আরো অনেকগুণ বেড়েছে। মাঝে মাঝে সে ঢাকা যায় শুধু ওই বই কিনে আনতে। তার ঘরে গাদা গাদা বই, দূর দূর থেকে মানুষেরা এই বই পড়া মানুষটাকে আর তার বই দেখতে আসে!

বই পড়তে পড়তে তার ভেতরে একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে, অনেক কিছুই সে খুব সহজে বুঝে ফেলে এবং সেটা সে আরো সহজে বোঝাতে পারে। অনেকটা খেয়ালের বসেই সে একটা বই লিখেছিলো, আধা সত্যি আধা কাল্পনিক। সেটা উপন্যাস বা প্রবন্ধ পুরোপুরি কোনটাই না, কিন্তু কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে পাঠকেরা খুব আগ্রহ নিয়ে সেটা পড়েছে। যারা লেখালেখি করে কিংবা যারা বই পড়ে তারা মোটামুটি ভাবে তার নাম জেনে গেছে। প্রকাশকেরা তাকে আরো লেখার জন্যে অনেক চাপ দিয়েছে কিন্তু সে আর লেখার সাহস পায় নাই। কেউ যদি প্রথম লেখাতেই নাম করে ফেলে তাহলে সে বিপদে পড়ে যায়– নূতন কিছু লিখতে ভয় পায়। তবে তার খানিকটা নাম হওয়ায় দুটি কাজ হয়েছে, প্রথমত বইয়ের প্রকাশক এবং বইয়ের দোকানগুলো তাকে প্রায় বিনি পয়সায় বই কিনতে দেয়। দ্বিতীয় কাজটি আরো চমকপ্রদ, বিদেশী একটা এন.জি.ও তাকে তাদের রিসার্চ ওয়ার্কার নামে রেখে দিয়েছে। মাঝে মাঝে কিছু কাগজপত্র পাঠায় সেগুলো দেখে তার কিছু মন্তব্য লিখে পাঠাতে হয়– এর বেশি কিছু নয়। এ জন্যে তাকে প্রতি মাসে বেশ খানিকটা টাকা পাঠিয়ে দেয়, এই টাকায় ঢাকা শহরে বাড়ীভাড়া করে থাকা যাবে না কিন্তু এই প্রত্যন্ত এলাকায় বাঁশের একটা ছাপরা ঘরে বেশ আরামেই থাকা যায়। রাজুর জীবনে খুব বড় উচ্চাশা নেই, সুন্দর নিরিবিলি ছাপরা একটা ঘরে বসে বসে বই পড়া তার কাছে চমৎকার একটা জীবন বলে মনে হয়।

স্কুল ঘরটার কাছাকাছি এসে দেখতে পেলো ছোট ছোট বাচ্চাগুলো সামনের ফাঁকা মাঠটাতে ছোটাছুটি করে খেলছে, তাকে দেখে সবাই খেলা বন্ধ করে ছুটে এলো! বাচ্চাগুলো তাকে ঘিরে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে থাকে, রাজু অন্যমনস্ক ভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। কমবয়সী শিশু আছে বলেই এই পৃথিবীটা টিকে আছে, যদি হঠাৎ করে পৃথিবীর সব শিশু বড় হয়ে যেতো তাহলে কী এই পৃথিবী টিকে থাকতো? যদি বা টিকে থাকতো তাহলে তার থেকে নিরানন্দ জায়গা কি আর কিছু হতে পারতো?

রাজু স্কুলের দাওয়ায় বসে বাচ্চাগুলোর মুখের দিকে তাকায়। এই বয়সের বাচ্চাদের মুখ থেকে দাঁত পড়ে আবার নূতন করে দাঁত উঠে। ফোকলা দাঁতের শিশু থেকে সুন্দর আর কী হতে পারে? একটু আগে গহ্বরে হাত স্পর্শ করার সাথে সাথে সে কী ভয়ংকর কিছু দৃশ্য দেখেছিলো, সেটা এখনো বুকের উপর ভার হয়ে চেপে আছে। বিশেষ করে দাঁত ভাঙ্গা সেই মানুষটা, কী কুৎসিত তার চেহারা। মাটি কুপিয়ে গর্ত করে, কী অবলীলায় কম বয়সী মেয়েটার শরীর সেখানে পুঁতে ফেলেছে।

"স্যার। আপনার কী হয়েছে? আপনি কথা বলেন না কেন? হাসেন না কেন?"

রাজু জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "মনটা ভালো নেই রে।"

"কেন স্যার আপনার মন ভালো নাই?"

"তোরা তো ছোট তোদের কতো আনন্দ। যা খুশী করতে পারিস। আমরা তো বড় মানুষ, আমাদের অনেক রকম ঝামেলা।"

ছোট একটা মেয়ে বলল, "আপনিও ছোট!"

অন্য সবাই মাথা নেড়ে বলল, "আপনি ছোট। আপনি ছোট।"

রাজু মুখে হাসি নিয়ে বলল, ঠিক আছে, "তোরা আমার মনটা ভালো করে দে। কে আমার মন ভালো করে দিবি?"

সবাই হাত তুলে চিৎকার করে বলল, "আমি! আমি!"

রাজু সবচেয়ে ছোট শিশুটাকে কাছে টেনে আনে। নাক থেকে সর্দি বের হয়ে আছে, একটু পরে পরে সেটা টেনে ভেতরে নেবার চেষ্টা করছে। সার্টের একটা মাত্র বোতাম, সেটা দিয়েই আটকে রাখা হয়েছে কিন্তু গোল পেটটা বের হয়ে আছে। প্যান্টটা বড় এবং হাঁটুর নিচে ঝুলে আছে। গলায় বড় একটা তাবিজ। শিশুটি হাসি হাসি মুখে এগিয়ে আসে, তারা সবাই রাজুর সাথে এই খেলাটি

খেলে। রাজু তাদের হাতটাকে নিজের হাতে ধরে চোখ বন্ধ করে বসে থাকে, একটু পরে চোখ খুলে বলে রাজুর মন ভালো হয়ে গেছে! তারা সবাই রাজুর কথা বিশ্বাস করে, কারণ তারা দেখেছে রাজু যখন তাদের কারো হাত স্পর্শ করে তখন তাদেরও মনটা ভালো হয়ে যায়। খেলতে খেলতে যখন তারা পড়ে গিয়ে ব্যথা পায় কিংবা কে আগে গোল্লাকে ছুয়েছে সেটা নিয়ে ঝগড়া করে নিজেদের মাঝে মারামারি করে রাজুর কাছে বিচার নিয়ে আসে তখন রাজু হাসি হাসি মুখে তাদের কথা শুনে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, সাথে সাথে তাদের রাগ দুঃখ সব কিছু উধাও হয়ে যায়। এই গ্রামের কোনো বড় মানুষ জানে না, শুধু ছোট বাচ্চারা জানে তাদের বই পড়া স্যার আসলে জাদু জানে। জাদু দিয়ে বইপড়া স্যার যে কোনো মানুষকে ভালো করে দিতে পারে।

রাজু ছোট শিশুটার হাত ধরে কয়েক সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে থাকে, তার মুখে তখন একটা হাসি ফুটে উঠে। চোখ খুলে সে ছোট বাচ্চাটার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলে, "আমার জন্যে একটা পেয়ারা এনেছিস, তাহলে দিচ্ছিস না কেন?"

ছোট বাচ্চাটা লাজুক মুখে তার পকেট থেকে একটা পেয়ারা বের করে রাজুর হাতে ধরিয়ে দিলো, রাজু তার হাত ধরে কেমন করে তার মনের কথাটি বুঝে গেলো সেটা নিয়ে তার মনে একবারও প্রশ্ন জাগলো না– তারা অনেকদিন থেকে জানে তাদের বই পড়া স্যার তাদের হাতে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে মনের কথা বুঝে ফেলতে পারে!

কিছুক্ষণের মাঝেই তেরো চৌদ্দ বছরের একটা মেয়ে হাজির হলো। এই গ্রামে লেখাপড়া জানা মানুষের খুব অভাব। শিউলী নামে গ্রামের এই মেয়েটির লেখাপড়ার খুব আগ্রহ, তাকেই একটু আধটু পড়িয়ে রাজু প্রস্তুত করে নিয়েছে। ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে সে পড়ায়। রাজুকে দেখে শিউলী খুশি খুশি গলায় বলল, "স্যার আপনি আমাকে যে বইটা দিয়েছিলেন সেটা পড়ে শেষ করেছি।"

"ভেরি গুড। এরপরে অরেকটা দেব। সেইটা শেষ হলে আরেকটা। এই ভাবে চলতে থাকবে।"

শিউলি দাঁত বের করে হেসে বলল, "স্যার। আপনার কাছে ভূতের বই নাই?"

"ভূত?"

"জী স্যার।"

"দেখি। পড়ে ভয় পাবে না তো?"

"না স্যার। আমার বেশি ভয় করে না।"

"গুড।" রাজু মুখে হাসি টেনে বলল, "যাও। বাচ্চাগুলোকে নিয়ে যাও। পড়াও।"

"আপনি কী করবেন স্যার?"

"আমি? আমি কিছু করব না। এইখানে আমি বসে থাকব।"

ভীড় করে থাকা বাচ্চাগুলো চিৎকার করে বলল, "আমরাও এইখানে বসে থাকব! আমরাও এইখানে বসে থাকব!"

রাজু মাথা নেড়ে বলল, "উহুঁ। তোমরা এখানে বসে থাকবে না। তোমরা ভিতরে যাবে। লেখাপড়া করবে।"

হালকা পাতলা একটা ছেলে বলল, "স্যার।"

"কী হলো?"

"আমার লেখাপড়া করার ইচ্ছা করে না।"

"তাহলে কী করার ইচ্ছে করে?"

ছেলেটি এদিক সেদিক তাকালো, এতোজন মানুষের সামনে তার আসলে কী করার চেষ্টা করে সেটা বলবে কী না সেটা নিয়ে চিন্তা করল। রাজু চোখ মটকে বলল, "আমাকে একলা একলা বলতে চাস?"

"জী স্যার।"

"ঠিক আছে। যখন কেউ থাকবে না তখন আসিস।"

রাজু জানে সে কী বলবে। এই ছেলেটার ভেতরে একটা ভবঘুরে ভবঘুরে ভাব আছে। সে ঘুরে বেড়াতে চায়– রাজু জানে ছেলেটা একদিন পালাবে, পালিয়ে একা একা সারা দেশ ঘুরে বেড়াবে। রাজু জানে এই ছেলেটার ভেতরে একটা সংসার বিমুখ সন্ন্যাসী জন্ম নিচ্ছে। সে কোনোদিন কথা বলে নি, তারপরেও সে জানে। রাজু ছেলেটার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, "এখন যা। ভেতরে গিয়ে একটু লেখাপড়া কর। বেশি করতে হবে না। এই একটু খানি!"

সবাই ভিতরে ঢুকে যাবার পর রাজু একটা নিঃশ্বাস ফেলে স্কুলের দেওয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকে। সামনে খোলা মাঠ তারপর নদী। নদীর তীরে অনেকগুলো নারকেল গাছ, বাতাসে তির তির করে নারকেল গাছের পাতাগুলো নড়ছে। মাঝামাঝি একটা নারকেল গাছে একটা বক বাসা বেঁধেছে। মাঝে মাঝেই

দেখে মা বক উড়ে যাচ্ছে বাচ্চাদের জন্যে খাবার আনতে।

রাজু ঠিক তখন বাতাসে হাহাকারের মতো একটা ডাক শুনতে পেলো, কেউ একজন যেন বহুদূর থেকে তাকে ডাকছে, রা-জু--উ-উ-উ-উ! রাজু চমকে উঠে, কিন্তু সে ঘুরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করে না, কারণ সে জানে, আশে পাশে কেউ তাকে খুঁজছে না। তাকে যে খুঁজছে সে বহুদূরে।

নাসিমা ম্যাডাম খুব জনপ্রিয় শিক্ষক, পঞ্চাশ মিনিটের ক্লাশ শেষ হবার পরও মাঝে মাঝেই আরো পনেরো বিশ মিনিট লম্বা হয়ে যায়। আজকেও তাই হলো, ক্লাশের সময় শেষ হবার পর আরো বিশ মিনিট ক্লাশ নিয়ে নাসিমা ম্যাডাম নিজের রুমে ফিরে এসে দেখে তার ডেস্কের সামনে একটি মেয়ে বসে আছে। ভালো করে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে নাসিমা আনন্দে চিৎকার করে ছুটে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "চৈতী! তুই?"

চৈতীও নাসিমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ওমা! তুই দেখি পুরো পুরি মাস্টারনী। হাতে খালি বেতটা নাই!"

দুইজন দুইজনকে ধরে খানিকক্ষণ চেচামেচি করে আবার চেয়ারে বসল। নাসিমা তার চশমাটা ভালো করে মুছে চৈতীর দিকে তাকিয়ে বলল, "ও মা চৈতী! তুই আরো কতো সুন্দর হয়েছিস। আমি ছেলে হলে নির্ঘাত তোকে বিয়ে করতাম।"

"ভাগ্যিস তুই ছেলে হোস নি!"

"কেন?"

"আমাকে যে বিয়ে করে তার বারোটা বেজে যায়! তোরও বারোটা বেজে যেতো।"

নাসিমা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন তোকে বিয়ে করলে বারোটা বেজে যায়?" চৈতীর কথাটাই একটা কৌতুক নাকি সঠিক ঠিক বুঝতে পারছিল না।

চৈতী হাসি হাসি মুখ করে বলল, "আমার হাজব্যান্ডের সাথে ডিভোর্স হয়ে গেছে তো, সেজন্যে বলছি।"

নাসিমা মুখ থতমত খেয়ে বলল, "আই এম সরি চৈতী। আমি জানতাম না।"

চৈতী বলল, "কেমন করে জানবি। এটা তো আর বিবিসির খবরে বলে নি!" চৈতী একটু সুর পাল্টে বলল, "আমার কথা থাক। তোর কথা বল।"

"আমার একটা হাজব্যান্ড। একটা বাচ্চা। হাজব্যান্ডটাও বোকা, বাচ্চাটাও বোকা। তাই মহানন্দে আছি।"

চৈতী হি হি করে হেসে বলল, "পুরা ফেমিলিতে শুধু তুই বুদ্ধিমান?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে জানিস তো?"

"কী?"

"যারা নিজেদের বুদ্ধিমান জানে আসলে তারাই সবচেয়ে বড় বোকা।"

নাসিমা মাথা নড়ল, বলল, "সেইটা ভুল বলিস নি। ঠিকই বলেছিস।"

দুই বান্ধবী কিছুক্ষণের মাঝেই তাদের পুরানো বন্ধু বান্ধবদের খোঁজ নিতে শুরু করল। বেশির ভাগই দেশের বাইরে। যারা ভেতরে আছে তারা ভালোই আছে। একজন শুধু রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে– খবরটা শুনে চৈতী অনেকক্ষণ অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল, এই ছেলেটার মতো হাসিখুশী ছেলে তাদের ক্লাশে আর কেউ ছিল না। ক্লাশের মেয়েদের প্রায় সবারই বিয়ে হয়ে গেছে, অর্ধেকের বেশি চাকরি বাকরি না করে পুরোপুরি হাউস ওয়াইফ।

চৈতী নিজের থেকে রাজুর কথা জিজ্ঞেস করল না, নাসিমাই বেশ সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করল, "রাজুর খবর জানিস?"

"না। কী হয়েছে?"

"সে তো মস্ত বড় লেখক।"

"তাই নাকী?"

"হ্যাঁ।" নাসিমা বলল, "একটা বই লিখেই নাম করে ফেলেছে।"

"কী বই?"

নাসিমা মুখ সূঁচালো করে বলল, "সেইটাই হয়েছে মুশকিল। কেউ বলে উপন্যাস, কেউ বলে প্রবন্ধ, কেউ বলে ইতিহাস কেউ বলে দর্শন!"

চৈতী চোখ কপালে তুলে বলল, "বাবা! একের ভেতর চার!"

"অনেকটা সেইরকম। আমার কী মনে হয় জানিস?"

"কী?"

"আমার মনে হয় কোনোটাই না। রাজু সবার সাথে ঠাট্টা করেছে। কেউ ধরতে পারে নি। ওর সাথে দেখা হয় না, দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম।"

"কেন? দেখা হয় না কেন? কোথায় থাকে?"

"কোথায় যে থাকে বলা মুশকিল। আমি যতদূর জানি একেবারে সমুদ্রের ভেতর ছোট একটা দ্বীপে থাকে।"

"কী করে সেখানে?"

"বই পড়ে।"

"বই পড়ে? আর কিছু করে না? সংসার চলে কীভাবে?"

নাসিমা মাথা নাড়ল, বলল, "সংসার থাকলে তো সংসার চলবে। একা মানুষ গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

চৈতীর আরো অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল, কিন্তু সে আর সেগুলো জিজ্ঞেস করল না, তার কেমন জানি লজ্জা করল। কিন্তু মোটামুটি খবর পেয়েছে, বাকী খবরটা সে নিজেই বের করে ফেলতে পারবে। নিউমার্কেটের দোকানগুলো ঘেটে সে রাজুর লেখা বইয়ের একটা কপি জোগাড় করলো, সেখান থেকে প্রকাশকের নাম বের করে সে তার অফিসে হাজির হলো। প্রকাশক উদ্যোগী মানুষ সে চৈতীকে রাজুর ঠিকানা জোগাড় করে দিলো।

বাসায় এসে চৈতী রাজুকে একটা চিঠি লিখলো, ছোট চিঠি। চিঠিটা খামে ভরে পোস্ট করে দিয়ে চৈতী অপেক্ষা করতে থাকে।

নীরা উত্তরার একটা গেস্ট হাউজে উঠেছে। ঢাকা শহরে এরকম অনেক গেস্ট হাউজ তৈরি হয়েছে, হোটেলের মতো এতো হাল ফ্যাশনের নয় কিন্তু থাকার জন্যে বেশ চমৎকার। যেদিন পৌঁছেছে সেদিন বিকাল বেলাতেই সে বাপ্পীকে নিয়ে ঘর থেকে বের হলো, অনেক পুরানো একটা ঠিকানা থেকে খুঁজে খুঁজে দোতলা একটা বাসা খুঁজে বের করে। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে কলিং বেল টিপে ধরতেই মধ্য বয়স্ক একজন মহিলা দরজা খুলে দিলো।

নীরা জিজ্ঞেস করল, "এটা কী জোয়ারদার সাহেবের বাসা?"

"হ্যাঁ।"

"আমি কী জোয়ারদার সাহেবের সাথে একটু দেখা করতে পারি?"

মহিলাটি পাথরের মতো মুখ করে বলল, "জোয়ারদার সাহেব কারো সাথে দেখা করেন না।"

"এটা খুবই একটা জরুরী ব্যাপার। গিয়ে বলেন আমি আমেরিকা থেকে এসেছি, আমার নাম নীরা।"

মহিলাটি ভিতরে ঢুকে গেলো এবং কিছুক্ষণ পর এসে বলল, "আসেন।"

মহিলাটির পিছু পিছু নীরা বারান্দা ধরে হেঁটে একটা বড় ঘরে এসে পৌছালো। ঘরের ভেতর আবছা অন্ধকার এবং মাঝখানে একটা ইজি চেয়ারে একজন মানুষ বসে আছে, তার চোখে কালো চশমা এবং তাকে দেখলেই বোঝা যায় যে মানুষটি অন্ধ। নীরার পায়ের শব্দ শুনে লোকটি মাথা না ঘুরিয়ে বলল, "আশা করছি কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নীরা।"

নীরা নিচু গলায় বলল, "আমি খুবই দুঃখীত জোয়ারদার। আমি এখন বুঝতে পারছি কাজটা খুবই অন্যায় হয়ে ছিলো।"

"তুমি কী এই কথা বলার জন্যে এসেছ?"

"না জোয়ারদার। আমি আমার ছেলেকে নিয়ে এসেছি।"

জোয়ারদার কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "ছেলেটাকে একটু দেখি।"

নীরা বাপ্পীর হাত ধরে তাকে জোয়ারদারের কাছে নিয়ে যায়। জোয়ারদার বাম হাতে তাকে ধরে রেখে, ডান হাতটা মুখের উপর বুলিয়ে নিয়ে বাপ্পীকে ছেড়ে দিয়ে বলল, "ভেরি হ্যান্ডসাম কিড। খুব সুন্দর চেহারা।"

"থ্যাংক ইউ।"

"তোমার জন্যে আমি তোমাকে এখানে আসতে দিই নি। তোমার ছেলের জন্যে দিয়েছি।"

"থ্যাংক ইউ।" নীরা বলল, "আমি আমার ছেলের জন্যেই তোমার কাছে এসেছি।"

"তুমি কী চাও?"

নীরা ফিসফিস করে বলল, "আমি আমার ছেলেটাকে বাঁচাতে চাই। তুমি সবকিছু জান জোয়ারদার। তুমি যেরকম সরে এসেছ আমিও এখন সরে আসছি।"

জোয়রদার ফিস ফিস করে বলল, "আমি সরে আসার কারণে আমার চোখ হারিয়েছি। একেকটা চোখে সতেরো ফোটা করে সালফিউরিক এসিড। তোমার কপালে কী জুটবে?"

"আমি জানি না। তা ছাড়া–"

"তাছাড়া কী?"

"আমি আমার ছেলের সামনে এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই না।"

জোয়ারদার নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে। বল, তুমি কী চাও?"

"রাজু নামের সেই ছেলেটার ঠিকানা। শুধুমাত্র সেইই পারবে আমার ছেলে বাপ্পীকে রক্ষা করতে।"

জোয়ারদার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তুমি নিশ্চয়ই তোমার বিপদের ঝুঁকি জান?"

"জানি।"

"তারপরেও তুমি চেষ্টা করবে?"

"হ্যাঁ।"

অন্ধ জোয়ারদার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তারপর বলল, "আমি যতদূর জানি ছেলেটা একটা বিদেশী এন.জি.ও এর রিসার্চার হিসেবে কাজ করে। এন.জি.ওটার নাম 'মাই গ্লোব'।"

"অফিসটা কোথায়?"

"মাই গ্লোবের অফিস ঢাকায় কিন্তু তুমি যে ছেলেটাকে খুঁজছ সে ঢাকায় থাকে না। সে থাকে সমুদ্রের তীরে কোনো একটা চরে।"

"চরে? সেখানে কেমন করে যায়?"

"জানি না। কাজটা সহজ না। ছেলেটা একটা বইও লিখেছিলো, বইটা বেশ ভালো পরিচিতি পেয়েছে। আমি পড়েছি। বইয়ের প্রকাশকের কাছে ঠিকানা পেতে পার।"

"কীসের উপর বই?"

"আধা উপন্যাস আধা ইতিহাস। ইন্টারেস্টিং।"

নীরা জোয়ারদারের কাছে বইটার নাম নিয়ে বের হয়ে এলো। চৈতীর মতো নিউমার্কেট ঘুরে সেও একটা বই কিনে আনে। সেও চৈতীর মতো বইয়ের প্রকাশককে খুঁজে বের করল। চৈতীর মতো সেও প্রকাশকের কাছ থেকে রাজুর ঠিকানা জোগার করল।

কোরায়শী ঢাকায় পৌঁছালো প্রায় এক সপ্তাহ পরে। এয়ারপোর্টে তার সাথে মোটা মতোন একজন লোক দেখা করল, বলল, "আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার কোরায়শী?"

"হ্যাঁ। আপনি?"

"আমার নাম বাকের। আপনাকে হোটেলে নিয়ে যেতে এসেছি।"

"গুড। কী খবর এখানে?"

"ভালো। আমরা খোঁজ খবর নিচ্ছি।"

"খোঁজ পেয়েছ কিছু?"

"হোটেলগুলোতে খোঁজ নিয়েছি। ছোট বাচ্চাকে নিয়ে কোনো মহিলা উঠে নি। এখন বাকী আছে মাঝারী হোটেল আর গেস্ট হাউস।"

"খোঁজ নাও।"

"গেস্ট হাউজ অনেক। সেটাই হচ্ছে সমস্যা।"

"এই দেশের সমস্যাটাই এই একটা। সবকিছুই অনেক। একটা মানুষ এসে পাকাপাকি ভাবে হারিয়ে যেতে পারে।"

বাকের নামের মানুষটা বলল, "আমরা এতো সহজে হারিয়ে যেতে দিব না। খুঁজে বের করবই করব।"

"ঢাকায় খুঁজে না পেলেও কোনো সমস্যা নেই। বাচ্চাটাকে নিয়ে কোথায় যাবে আমরা জানি। আমরা সেখানে ধরব।"

"জী স্যার।"

"রাজু নামের ছেলেটাকে ট্র্যাক করা গেছে তো?"

"গেছে স্যার।"

"গুড।" কোরায়শী হাসি হাসি মুখে বলল, "আমরা সেখানে ধরব।"

"অবশ্যই স্যার। লুসিফারের দোহাই।"

কোরায়শী মাথা নাড়ে, "লুসিফারের দোহাই।"

হোটেলের সামনে গাড়ী থেকে নামার সময় কোরায়শী বলল, "বাকের।"

"জী স্যার।"

"আমি হোটেলে থাকতে চাই না।"

"কোথায় থাকবেন লীডার?"

"একটা লঞ্চ ভাড়া কর। বেশি বড় দরকার নেই কিন্তু ভালো লঞ্চ। মর্ডান। সব রকম সুযোগ সুবিধা যেন থাকে।"

"ঠিক আছে স্যার।"

"সেই লঞ্চ দিয়ে রওনা দিয়ে দিব। জায়গাটাতে আগেই পৌঁছাতে চাই।"

"কোনো সমস্যা নেই লীডার।"

চৈতীর ঘুম ভেঙ্গে যায় শেষ রাতে। আবার বিকেল বেলাতে কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে পারে না। ব্যাপারটার নাম জেট লেগ আর এই জেট লেগ থেকে বের হতে তার কম পক্ষে এক সপ্তাহ সময় লেগে যাবার কথা। মাত্র চারদিন পার হয়েছে কাজেই চৈতী ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করছে। কাজেই চতুর্থদিন বিকেল বেলা তার যখন একটা টেলিফোন এলো সে তখন গভীর ঘুমে। কোনোমতে উঠে সে ঘুম ঘুম চোখে গিয়ে ফোনটা ধরল। বলল, "হ্যালো।"

"চৈতী?'

সাথে সাথে চৈতীর ঘুম ভেঙ্গে গেল, "কে রাজু?"

"হ্যাঁ। তুমি কী ঘুমাচ্ছ?"

এক সময় তারা তুই তুই করে কথা বলতো, এতোদিন পার হয়েছে এখন আর মুখে তুই আসতে চায় না। চৈতী বলল, "না, মানে একটু শুয়েছিলাম।"

"সরি, তোমার ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে দিলাম।"

"না না– তোমার সরি হওয়ার কী আছে?"

"কেমন আছ?"

"ভালো। তুমি?"

"হ্যাঁ আমিও ভালো। তোমাদের সবাই ভালো আছে।"

"হ্যাঁ, অন্য সবাইও ভালোই আছে। মোটামুটি।"

"তারপর তোমার কী খবর?"

"এইতো চলে যাচ্ছে। তোমার কী খবর?"

"আমারও চলে যাচ্ছে।"

চৈতী হঠাৎ করে আর কী বলবে বুঝতে পারে না। কয়েক সেকেন্ড এক ধরনের নৈঃশব্দ কাজ করে, তখন সে একটা চাপা হাসির শব্দ শুনতে পায়। চৈতী জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো? তুমি কী হাসছ নাকী?"

"হ্যাঁ। হাসছি।"

"কেন? এর মাঝে হাসির কী হলো?"

"আমাদের দুজনের কথা শুনে।"

এবারে চৈতীও হেসে ফেলল, বলল, "ঠিকই বলেছ! আমাদের দুজনের কথা খুবই প্যাথেটিক। কেমন আছ, ভালো আছি ছাড়া আর কিছু বলছি না।"

রাজু বলল, "আসলে আমি টেলিফোনে কথা বলতে পারি না। কে যে এই যন্ত্রটা আবিষ্কার করেছে।"

"ঠিকই বলেছ। আমিও পারি না।"

"কথা বলার সময় আমি যদি মানুষটাকে দেখতে না পাই চোখের দিকে তাকাতে না পারি, মুখের ভাবভঙ্গী দেখতে না পারি, হাত পা কেমন করে নড়ে দেখতে না পারি– তাহলে কথা বলার কোনো আনন্দ আছে?"

"নাই।"

"তা ছাড়া আরেকটা জিনিষ লক্ষ করেছ?"

"কী?"

"আমরা এক সময় তুই তুই করে বলতাম। এখন তুমি তুমি করে বলছি।"

"সেইটা ঠিক আছে।"

রাজু জিজ্ঞেস করল, "কেন ঠিক আছে?"

"তুই তুই করে কথা বলে কম বয়সীরা– মানুষ যখন বড় হয় একটু ম্যাচিওর্ড হয় তখন তুই তুই করে কথা বলে না।"

"আমরা ম্যাচিওর্ড হয়েছি?"

"হই নাই? তুমি এতো বড় লেখক হয়েছ–"

রাজু আবার শব্দ করে হাসলো। চৈতী জিজ্ঞেস করল, "কী হলো হাসছ কেন?"

"আমি লেখক হয়েছি শুনে!"

"হও নাই?"

"না।"

"তাহলে কী হয়েছ?"

"বিশেষ কিছু হই নাই– আমি আগের মতোই আছি। বরং বলা যায় সিরিয়াস ডিমোশান হয়েছে।"

"ডিমোশান? কেন?"

"আগে ঢাকা শহরে থাকতাম এখন একটা চরে থাকি!"

"আমি শুনে মোটেও অবাক হই নাই। আমার একটা ধারণা ছিলো তুমি কোনো চরে কিংবা কোনো বনে জঙ্গলে থাকবে!"

"সত্যি?"

"সত্যি!"

"চৈতী।"

"বল।"

"তোমার সাথে সামনা সামনি কথা বলার ইচ্ছে করছে।"

চৈতী এক মুহূর্তের জন্যে চুপ করে থেকে বলল, "আমারও।"

"চলে এসো।"

"চলে আসব?"

"হ্যাঁ। আমি কীভাবে থাকি। দেখে যাও।"

"দেখে যাব?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি ভাবছ আমি আসতে পারব না?"

রাজু শব্দ করে হাসল, বলল, "পারবে না কেন? নিশ্চয়ই পারবে।"

"ঠিক আছে। আমি আসছি।"

রাজু বলল, "না চৈতী, তোমার আসতে হবে না। আমি এমনি এমনি বলছিলাম।"

"তুমি এমনি এমনি বলেছ, আমি এমনি এমনি নিই নি। আমি আসছি।"

রাজু এবারে একটু ব্যস্ত হয়ে বলল, "চৈতী! এখানে আসলে তোমাকে রাখা খুব সহজ হবে না।"

"তোমার আমাকে রাখতে হবে কে বলেছে, আমি নিজেই ম্যানেজ করে নেব।"

"বাথরুমের অবস্থা খুবই খারাপ।"

"তোমার ধারণা আমি আমার জীবনটা এক বাথরুম থেকে অন্য বাথরুমে কাটিয়ে দেই।"

"না, তা নয়–"

"তাহলে প্রস্তুত হও। আমি আসছি।"

"সত্যি?"

"সত্যি।"

রাজু বলল, "থ্যাংক ইউ চৈতী। আমি তোমাকে খুব মিস করেছি।"

চৈতী কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলো। তারপর খুব সাবধানে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

রাজু চৈতীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, সে তখনো জানতো না তার কাছে একটা লঞ্চ ভাড়া করে আসছে কোরায়শী– একই সাথে আসছে নীরা তার ছোট ছেলেটিকে নিয়ে।

যারা আসছিলো তারা কেউই জানতো না, ঠিক তখন বঙ্গোপসাগরে বহুদূরে একটা নিম্নচাপের জন্ম হয়েছে। কেউ জানতো না কয়েকদিনের মাঝেই সেটা একটা পরিপূর্ণ ঘূর্ণিঝড় হয়ে ধেয়ে আসবে তাদের কাছে।

চৈতী নৌকায় ছইটা ধরে দাঁড়িয়েছিল, ঝকমকে সাদা একটা লঞ্চ নদীর ঘাটে বাঁধা রয়েছে নৌকাটা তার পাশ দিয়ে বেয়ে নিয়ে গেলো নৌকার মাঝি। লঞ্চের ডেকে চোখে কালো চশমা পরে একজন মানুষ দাঁড়িয়েছিলো, চোখে কালো চশমা পরলে একজন মানুষ কোন দিকে তাকিয়ে আছে বোঝা যায় না, কিন্তু চৈতীর কেন জানি মনে হলো মানুষটি চোখের কোণা দিয়ে তাকেই লক্ষ করছে।

চৈতী বলল, "কী সুন্দর লঞ্চ।"

"জে আপা।" মাঝি বলল, "দুইদিন থেকে এইখানে দাড়ায়া আছে। লড়ে চড়ে না।"

"দুইদিন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছে?"

"জে আপা। খুবই সন্দেহজনক কাজ কারবার।"

"কেন? খুবই সন্দেহজনক কেন? কী করে?"

"কিছুই করে না। সেইটাই তো সন্দেহজনক।"

চৈতী হেসে ফেলল, বলল, "ভালোই বলেছেন। কিছুই করে না। সেটাই হচ্ছে সন্দেহজনক।"

নৌকাটা থেমে থাকা লঞ্চটা পার হয়ে এগিয়ে যায়, চৈতী একবার পিছন ফিরে তাকালো, কালো চশমা পরা মানুষটা এখনো ঠিক একইভাবে দাঁড়িয়ে

আছে, চৈতীর ভেতরে কেমন যেন অস্বস্তি হয়, মনে হয় মানুষটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকেই দেখছে।

চৈতীর ধারণা ভুল নয়। কোরায়শী তার ভাড়া করা লঞ্চে দুদিন আগে এখানে চলে এসেছে। নীরা যদি তার বাচ্চাটিকে নিয়ে আসে তাহলে তাকে এদিক দিয়েই আসতে হবে, কোরায়শী তাই অপেক্ষা করছে। এখানে দাঁড়িয়ে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আসলেই চৈতীকে দেখছিলো। তার চোখে এক ধরনের লালসা ছিলো, লালসা ছাড়া অন্য কোনো দৃষ্টিতে সে কখনো কোনো মেয়ের দিকে তাকায় নি। তাকাতে জানে না। কালো চশমা দিয়েও তার সেই দৃষ্টিকে সে ঢেকে রাখতে পারে না।

নদীর ঘাটে রাজু দাঁড়িয়েছিলো, চৈতীর নৌকাটা থামার পর সে একটু নিচে নেমে আসে। মাঝি চৈতীর হাত ধরে সাবধানে নামানোর চেষ্টা করল, তারপরেও তার পায়ে একটু কাদা লেগে যায়। মাঝিকে সেজন্যে খুবই অপ্রস্তুত দেখায় যেন নদী, নদীর ঘাট, কাদা এবং পানি সবকিছুর জন্যে সেই দায়ী।

রাজু আর চৈতী একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। দুজনেই একজন আরেকজনকে দেখে কেমন জানি একটু লজ্জা পেয়ে যায়। রাজু বলল, "তুই ঠিক আগের মতোই আছিস চৈতী।"

চৈতী মাথা নাড়ল, বলল, "উহু। তুই না। বল তুমি।"

"তুমি বলতে হবে?"

"হ্যাঁ।"

রাজু একটু হাসলো, বলল, "তুমি ঠিক আগের মতোই আছ, চৈতী।"

"তুমিও।" চৈতী একটু হেসে যোগ করল, "গোঁফটা ছাড়া। তোমাকে গোঁফ রাখার বুদ্ধি কে দিয়েছে?"

"আমাদের দাড়ি গোঁফ হচ্ছে সিজনাল। আসে যায়। এর জন্যে বাইরের কারো বুদ্ধির দরকার হয় না।"

"এখন যেটা আছে সেটা কী আসছে না যাচ্ছে?"

"আপাততঃ আসছে।"

"চৈতী অকারণেই হি হি করে হাসল এবং চৈতীকে হাসতে দেখে রাজুও হেসে ফেলল।"

রাজু চৈতীর ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, "চল যাই। একটু হাঁটতে হবে কিন্তু।"

"আমি হাঁটতে পারি। রোদ না থাকলে আমি যতদূর ইচ্ছা ততদূর হাঁটতে পারি।"

রাজু আকাশের দিকে তাকালো হঠাৎ করে তার মুখে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ে, সে চিন্তিত গলায় বলল, "হঠাৎ করে রোদ নাই হয়ে গেছে। আকাশে মেঘের নিশানাটা খুব ভালো মনে হচ্ছে না।"

"কেন?"

"মনে হচ্ছে কোথাও একটা নিম্নচাপ হয়েছে। আবার না একটা ঝড় আসে। ঘূর্ণিঝড়।"

চৈতী কোনো কথা না বলে রাজুর পাশাপাশি হাঁটে, যখন একসাথে লেখাপড়া করেছে তখন রাজু ছিলো সহপাঠি, বাচ্চা একটা ছেলে। এখন রাজু আর বাচ্চা ছেলে না– রীতিমতো একজন মানুষ। পুরুষ মানুষ। তার গোঁফটাকে নিয়ে সে ঠাট্টা করেছে সত্যি কিন্তু আসলে খুব মানিয়েছে এই গোঁফে। পৃথিবীতে খুব কম মানুষই আছে যাদেরকে গোঁফ মানায়।

ঠিক এরকম সময় বড় একটা জাহাজের ডেকে নীরা আর বাপ্পী বসেছিলো। নদীর ঠান্ডা বাতাসে দুজনেরই চুল উড়ছে। বাপ্পী এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে নদীর দিকে তাকিয়েছিলো। সে আগে কখনো নদী দেখে নি, এতো বড় একটা নদী দেখে তার বিস্ময়ের সীমা নেই। নদী থেকেও তার বিচিত্র মনে হয় নৌকাগুলো, কতো বিচিত্র রকম নৌকা তার মাঝে কতো বিচিত্র মানুষ বসে আছে। বিশাল একটা নদীর ঠিক মাঝখানে ছোট একটা নৌকা, নদীর বিশাল ঢেউয়ে সেটা দুলছে তার মাঝখানে একজন মানুষ নদীতে জাল ফেলছে, মানুষটার সাহস দেখে বাপ্পী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, জাহাজের খাবার খেতে পারবে না জেনে নীরা কিছু স্যান্ডউইচ নিয়ে এসেছিলো। কেবিনে বসে দুজনে মিলে সেটা খেয়ে আবার ডেকে এসে বসে। দিনের আলোতে বিশাল নদীটাকে লেগেছিলো একরকম, অন্ধকার নেমে যাবার পর সেই নদীটাকেই আবার সম্পূর্ণ অন্যরকম মনে হতে থাকে। বাপ্পী ডেকের পাশে একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

রাত্রিবেলা যখন স্টীমারের সবাই শুয়ে পড়েছে তখনও বাপ্পী ডেকের পাশে বসে রইল। নীরা ডাকল, বলল, "বাপ্পী আয়। ঘুমাবি।"

"আমার ঘুম আসছে না আম্মু। আমি আরেকটু বসে দেখি?"

"অন্ধকারে তুই কী দেখছিস?"

"অন্ধকারেও দেখা যায় আম্মু।"

"নদীর বাতাস খুব ঠান্ডা কিন্তু।"

"আমার ঠান্ডা লাগে না।"

নীরা কোনো কথা বলল না। সেও আগে লক্ষ করছে বাপ্পীর ঠান্ডা লাগে না। প্রচন্ড শীতেও সে একটা শার্ট পরে থাকতে পারে। বাপ্পী ভেতরে যাবে না শুনে নীরাও তখন তার পাশে এসে দাঁড়ালো। দুজনে বিশাল নদীর দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ করে নীরা এক ধরনের ডানা ঝাপটানির শব্দ শুনতে পেলো। কিছু বোঝার আগেই সে অবাক হয়ে দেখতে পায় অসংখ্য বাদুর উড়ে আসছে, কাছাকাছি এসে বাদুরগুলো তাদের ঘিরে উড়তে থাকে, এতো কাছে দিয়ে সেগুলো উড়ে যেতে থাকে যে নীরা স্পষ্ট তাদের কুতকুতে চোখ আর ধারালো দাঁতগুলো দেখতে পেলো। নীরা একটা হ্যাঁচকা টানে বাপ্পীকে টেনে নিয়ে ছুটে নিজেদের কেবিনের ভেতর ঢুকে গেলো। পিছন পিছন বাদুরগুলো উড়ে আসতে থাকে– দরজার ভেতর দিয়ে কয়েকটা বাদুরও কেবিনের ভেতর ঢুকে যায়। ছোট কেবিনের ভেতর বাদুরগুলি ডানা ঝাপটিয়ে উড়তে থাকে, কর্কশ স্বরে চিৎকার করে হঠাৎ একটা বাপ্পীর উপড় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

নীরা একটা কাপড় দিয়ে খপ করে বাদুরটাকে ধরার চেষ্টা করল, বাদুরটা তখন বাপ্পীকে ছেড়ে আবার উড়তে শুরু করে। কর্কশ শব্দ করে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বাদুরগুলো ছোট কেবিনটার ভেতর উড়তে থাকে– নীরা এক ধরনের হিংস্র উন্মত্ততায় বাদুরগুলিকে কাপড় দিয়ে মারতে থাকে, ঠিক তখন দরজা একটু ফাঁক হয়ে গেলো, আর বাদুরগুলো কর্কশ শব্দ করতে করতে বাইরে উড়ে গেল।

নীরা দরজা বন্ধ করে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে তার বিছানায় বসে রইল। বাপ্পী খানিকটা ভয় এবং অনেকখানি বিস্ময় নিয়ে নীরার দিকে তাকিয়ে রইল। নীরা জিজ্ঞেস করল, "বাদুরটা তোকে কামড়িয়েছে?"

"না, আম্মু। কামড়াতে পারে নি।"

"ঠিক তো?"

"ঠিক।"

"অনেক বাঁচা বেঁচে গিয়েছি।"

"কেন আম্মু?"

"এই বাদুর অসম্ভব বিষাক্ত। মনে হয় র‍্যাবিড। কামড় দিলেই সর্বনাশ।"

"বাপ্পী নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে বলল, "এখানে হঠাৎ করে বাদুর কেমন করে এসেছে আম্মু?"

"এগুলো বাদুর নয়।"

"এগুলো কী?"

"আমি জানি না। আসলে আমাদের খোঁজ নিতে এসেছে।"

"খোঁজ নিতে এসেছে?"

"হ্যাঁ।"

নীরার মুখে হঠাৎ গভীর দুশ্চিন্তার একটা ছাপ পড়লো। সে বাপ্পীকে নিজের কাছে টেনে এনে বলল, "বাপ্পী। শোন।"

"কী আম্মু।"

"তোকে বলেছিলাম না খুব খারাপ কিছু মানুষ তোকে আর আমাকে খুঁজছে।"

বাপ্পী ভয় পাওয়া গলায় বলল, "হ্যাঁ আম্মু বলেছিলে।"

"আমি ভেবেছিলাম আমি তাদের ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছি। এখন বুঝতে পারছি যে আসলে আসতে পারি নি। সেই খারাপ মানুষগুলি আসলে আমাদের খোঁজ পেয়ে গেছে। তারা এখন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

"কেন অপেক্ষা করছে আম্মু?"

"সেটা আমি তোকে বুঝাতে পারব না, শুধু জেনে রাখ, তারা তোকে দিয়ে খুব ভয়ঙ্কর একটা জিনিষ করতে চায়।"

"তাহলে এখন কী হবে আম্মু?"

"আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে যে মানুষটা সেই মানুষটার নাম রাজু। নামটা মনে থাকবে?"

"মনে থাকবে।"

"বল দেখি একবার।"

"রাজু।"

"চমৎকার। আমরা এখন রাজুর কাছে যাচ্ছি। রাজু নামের সেই মানুষটা ছাড়া

পৃথিবীর আর কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। কাজেই আমাদের তার কাছে যেতেই হবে। যেভাবে হোক, যেতেই হবে। বুঝেছিস?"

"বুঝেছি।"

"যদি আমার কিছু হয় তুই কিন্তু থামবি না।"

"তোমার কী হবে?"

"যাই হোক। তুই কিন্তু থামবি না। তুই কিন্তু ছুটে যাবি। ছুটে ছুটে রাজুর কাছে যাবি।"

"আমি কোনদিকে ছুটে যাব?"

"আমি তোকে বলে দেব।"

"রাজুকে আমি কেমন করে চিনব?"

"সেটাও আমি বলে দিব।"

বাপ্পী মাথা নাড়ল, বলল, "ঠিক আছে আম্মু।"

নীরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাপ্পীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। বাপ্পী একটু অস্বস্তিবোধ করে, বলে, "তুমি এভাবে তাকিয়ে আছ কেন আম্মু?"

"তোকে দেখছি।"

"কী দেখছ?" বাপ্পী একটু হাসার চেষ্ট করে বলল, "তুমি আমাকে আগে দেখ নি?"

"যতটুকু দেখা উচিত ছিল ততটুকু দেখি নি।" নীরা একটা বড় নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "বাপ্পী, বাবা আমার।"

"কী আম্মু?"

"তুই আমাকে ক্ষমা করে দিবি?"

"কী বলছ আম্মু?"

"আমিও আসলে খুব খারাপ একজন মানুষ ছিলাম। খুব, খুব খারাপ।"

"না আম্মু, তুমি মোটেও খারাপ না।"

নীরার হঠাৎ গলা ধরে আসে, তার চোখে একটু পানি চলে আসে, সারা জীবনে এর আগে কখনই তার চোখে পানি আসে নি। চোখে পানি এলে কেমন লাগে নীরা আগে কখনোই জানতে পারে নি। শাড়ীর কোণা দিয়ে সে চোখ মুছে বলল, "বাপ্পী, সোনা আমার। তোর ওপর যে এখন এতো বড় বিপদ সেটার জন্যে কিন্তু আমি দায়ী। আমি তোর এতো বড় সর্বনাশ করেছি।"

বাপ্পী মাথা নাড়ল, বলল, "না আম্মু, তুমি মোটেও সর্বনাশ কর নি।"

"করেছি। তাই এখন চেষ্টা করছি তোকে রক্ষা করতে।"

"তুমি এভাবে কথা বল না আম্মু।" বাপ্পী নীরার কাছে গিয়ে হাত ধরে বলল, "তুমি এভাবে কথা বললে আমার খুব খারাপ লাগে।"

নীরা দুই হাত দিয়ে বাপ্পীকে টেনে নিজের বুকে শক্ত করে চেপে ধরে ফিস ফিস করে বলল, "বাপ্পী, সোনা আমার, বাবা আমার, তোকে আমি কতো কষ্ট দিয়েছি।"

"না আম্মু, কষ্ট দাও নি।"

"দিয়েছি। আমি আসলে খুবই বোকা ছিলাম, তা না হলে তোর মতোন এরকম সোনার ছেলেকে কেউ কষ্ট দেয়? আমি যদি পারতাম তাহলে আমার বাকী জীবনটা তোকে এভাবে বুকে চেপে রাখতাম।" নীরা গভীর মমতায় বাপ্পীকে বুকে চেপে ধরে বলল, "ঠিক এভাবে।"

বাপ্পী মায়ের বুকে মাথা গুঁজে বসে থাকে, তার বুকের ভেতর থেকে সব ভয় আতংক আর দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়।

গভীর রাতে বাপ্পীর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। খট খট করে একটা শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে খুব কাছে থেকে শব্দটা আসছে। বাপ্পী নিজের বিছানায় বসে সাবধানে তার জানালার কাছে এগিয়ে যায়। জানালার পর্দাটা টেনে সরাতেই দেখলো সেখানে একটা কুৎসিত মুখ। মুখটা মানুষের মতোই কিন্তু পুরোপুরি মানুষের নয়। উঁচু কপাল, গভীর গর্তের মাঝে দুটি কুতকুতে চোখ, থ্যাবড়া নাক এবং বড় একটা মুখ। ধারালো দাঁতের ফাঁকে লকলকে একটা জিব।

বাপ্পীকে দেখেই প্রাণীটি লাফ দিয়ে সরে যায়, বাপ্পী দেখে তার শরীরে কোনো কাপড় নেই, সারা শরীর বড় বড় লোমে ঢাকা। তার হাতে একটা কুড়াল সেটা নিয়ে লাফাতে লাফাতে সে উপরের দিকে চলে যায়। একটু পরেই কুড়াল দিয়ে ধাতব কিছুকে আঘাত করার বিকট শব্দ হতে থাকে।

বাপ্পী কী করবে বুঝতে না পেরে চুপ করে বসে থেকে আবার একসময় ঘুমিয়ে পড়লো। তার ঘুম হলো ছাড়া ছাড়া, ঘুমের মাঝে সে নানা রকম স্বপ্ন দেখলো। মাঝে মাঝে তার ঘুম ভাঙ্গে তখন সে অনেক মানুষের কথাবার্তা শুনতে

পেলো, কে কথা বলছে, কী নিয়ে কথা বলছে সেটা বোঝার চেষ্টা করতে করতে বাপ্পী আবার ঘুমিয়ে গেলো।

ভোরবেলা নীরা বাপ্পীকে ঘুম থেকে ডেকে তুললো। বাপ্পী জানতে চাইলো, "আমরা এসে গেছি আম্মু?"

"হ্যাঁ, বাবা। এখানে নামতে হবে। বাকীটা নৌকায় যেতে হবে।"

"নৌকায়?"

"হ্যাঁ। সেখানে জাহাজ যায় না।"

"ও।"

নীরা তাদের ব্যাগ দুটি নিয়ে বের হলো, বাপ্পী এদিক সেদিক তাকিয়ে হঠাৎ তার মা'কে ডাকলো, "আম্মু।"

"কী হলো?"

"কাল রাতে অনেক মানুষ চিৎকার করছিলো কেন?"

নীরা চোখ বড় বড় করে বলল, "রাতে জাহাজে অনেক বড় বিপদ হয়েছিলো।"

"কী বিপদ?"

"জাহাজের যে স্টিয়ারিং হুইল থাকে সেটার সাথে যে চেন লাগানো ছিলো সেই চেনটা কে জানি কেটে ফেলেছিলো।"

"কেটে ফেলেছিলো?"

"হ্যাঁ। সেই জন্য জাহাজটা আর কন্ট্রোল করতে পারছিলো না, সোজা একটা চরে ধাক্কা দিতে যাচ্ছিল।"

"সর্বনাশ।"

"হ্যাঁ। সারেং খুব এক্সপার্ট। সে কীভাবে কীভাবে জানি জাহাজটাকে বাঁচিয়েছে। তারপর চেনটাকে মেরামত করেছে।"

বাপ্পী এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। নীরা জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"তুমি জান চেনটা কে কেটেছে?"

"না জানি না। কেমন করে জানব?"

"আমি জানি।"

"তুই কেমন করে জানিস?"

"আমি দেখেছি।"

"তুই দেখেছিস?"

"প্লেনের পাখায় ওপরে একটা মানুষ ছিলো মনে আছে? কুড়াল দিয়ে পাখাটা কাটার চেষ্টা করেছিলো?"

"হ্যাঁ।"

"সেই মানুষটা। আমি কাল রাতে দেখেছি।"

নীরা কোনো কথা না বলে বাপ্পীর দিকে তাকিয়ে রইল।

জাহাজ থেকে নামার সময় বাপ্পী আর নীরা যখন একটা মুরগীর খাঁচার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ করে সবগুলো মুরগী আতংকিত হয়ে ডাকতে শুরু করল। ভয় পেয়ে খাঁচার একপাশে সরে গিয়ে এমনভাবে হুটোপুটি করতে থাকে যে মনে হতে থাকে ভয়ঙ্কর কিছু একটা তাদের আক্রমণ করেছে।

জেটিতে কয়েকটা নেড়ি কুকুর ছিল, মানুষের ফেলে যাওয়া খাবারের বাক্স কামড়াকামড়ি করে খাচ্ছে। বাপ্পী আর নীরা তাদের কাছাকাছি আসা মাত্রই কুকুরগুলো হঠাৎ আতংকিত হয়ে পায়ের নিচে লেজ ঢুকিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটতে থাকে।

নীরা বাপ্পীর দিকে তাকালো, তার মাঝে খুব একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে, চেহারার মাঝে এক ধরনের কাঠিন্য উঁকি মারতে শুরু করেছে, চোখের নিচে কালি এবং জ্বলজ্বলে চোখ। শুধু তাই নয় তার শরীর থেকে এক ধরনের গন্ধ বের হতে শুরু করেছে, ঝাঁঝালো অস্বস্তিকর একটা গন্ধ। নীরা বুকের ভেতরে কাঁপুনী অনুভব করে, যদি সময়মতো তাকে রাজুর কাছে নিতে না পারে তাহলে কী হবে?

জেটি থেকে বের হয়ে আবিষ্কার করল বাইরে গুড়িগুড়ি বৃষ্টি, তার সাথে এক ধরনের ঝড়ো বাতাস। হঠাৎ করে আবহাওয়াটা এতো খারাপ হয়ে গেলো কেমন করে কে জানে?

ব্যাগ হাতে নিয়ে নীরা নদীর ঘাটের নৌকাগুলোর কাছে এগিয়ে যায়। মাঝিরা ভেতরে বসে অলস ভঙ্গীতে বিড়ি, সিগারেট খাচ্ছে। নীরা আর বাপ্পীকে দেখে খানিকটা কৌতূহল নিয়ে তাদের দিকে তাকালো। নীরা জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কেউ যাবেন?"

"কোথায়?"

নীরা চরের নামটি বলা মাত্রই মাঝিরা প্রায় এক সাথে মাথা নাড়ল, বলল, "জী না। এই আবহাওয়াতে ঐখানে যাওয়ার কোনো উপায় নাই।"

"কেন উপায় নেই?"

বয়স্ক একজন বলল, "গাঙের অবস্থাটা দেখেন না? ঝড় আসতেছে। এর মাঝে দুই নম্বর বিপদ সংকেত হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি? ঘূর্ণিঝড় আসছে?"

"জে।"

"কিন্তু ঘূর্ণিঝড় আসুক, টর্নোডা আসুক আর সুনামি আসুক আমাকে যেতেই হবে।"

"কেন?"

"বলতে পারেন জীবন মরণ সমস্যা। বলেন কে যাবেন, আপনাদের যত ভাড়া তার ডবল ভাড়া দিব।"

বৃদ্ধ মাঝি বলল, "এই আবহাওয়ার মাঝে ডবল কেন আপা ডবলের ডবল দিলেও কেউ যাবে না।"

নীরা ব্যাকুল হয়ে বলল, "কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।"

"কেন?"

"না গেলে আমার ছেলেটাকে আমি বাঁচাতে পারব না। বিশ্বাস করেন।"

"কী হয়েছে আপনার ছেলের?"

নীরা ঠিক কী বলবে বুঝতে পারল না। ইতস্তত করে বলল, "অসুখ। খুব ভয়ঙ্কর অসুখ। সেই অসুখের চিকিৎসা জানা আছে পৃথিবীর একমাত্র একটা লোকের। আমাদের সেই লোকের কাছে যেতে হবে। যেতেই হবে।"

মাঝিরা নিঃশব্দে তার দিকে তাকিয়ে রইল। নীরা বলল, "যত টাকা চান তত টাকা দিব। তবু কোনো একজন চলেন! প্লীজ!"

এক কোণায় দাঁড়িয়ে থাকা কম বয়সী একটা মাঝি বলল, "আসেন এই দিকে।"

নীরা রীতিমতো নৌকাটার দিকে ছুটে গেলো, কৃতজ্ঞ গলায় বলল, "থ্যাংক ইউ মাঝি ভাই। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ এ মিলিয়ন।"

বশির নামের কম বয়সী শক্ত সামর্থ মাঝি দুজনকে নৌকায় তুলে। প্রায় সাথে সাথেই তার নৌকাটা নিয়ে রওনা দিল। মহিলাটা বলেছে যত টাকা চায় তত টাকা

দিবে, তার আসলেই টাকার দরকার। কোনোভাবে মহিলাকে তার ঠিকানায় পৌছে দিলেই সে কড়কড়ে অনেকগুলো টাকা পেয়ে যাবে। তার চেয়ে বড় কথা মহিলাটা বিপদে পড়েছে। তার বাবা মরার সময় বলেছিলো কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করিস। সে না হয় একটু সাহায্য করল।

ছাগলের কাটা মাথাটার উপর একটা জবা ফুল রেখে কোরায়শী এক পা পিছিয়ে এলো। পাথরের একটা বাটিতে ধূপ পুড়ছে। সামনে দেয়ালে অনেকটা গ্রাফিতির মতো করে কিছু নকশা আঁকা রয়েছে। মেঝেতেও নকশা আঁকা। লাল রঙয়ের জবা ফুল পুরো হল ঘরটাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ঘরের কোণায় একটা ছোট সাউন্ড সিস্টেমে ল্যাটিন ভাষায় কিছু দুর্বোধ্য মন্ত্র জপ করা হচ্ছে। কোরায়শী একটা কালো আলখাল্লা পরে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে চোখ বন্ধ করে বিড় বড়ি করে বলল, "হে অন্ধকার জগতের প্রভু, তোমার প্রতি আমার অভিনন্দন। আমার সমস্ত কিছু তোমার প্রতি নিবেদিত। আমি তোমার কাছে আমার আত্মা সমর্পন করেছি তার বিনিময়ে তুমি আমাকে তোমার শক্তির অংশীদার করেছ। তোমার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। আমাকে তোমার শক্তির অংশীদার করো, আমি তোমার আনুগত্য গ্রহণ করি–" তারপর সে বিড় বিড় করে কিছু ল্যাটিন মন্ত্র আওড়ায়। মন্ত্রগুলো শেষ করে সে চোখ খুলে তাকিয়ে বিড় বিড় করে বলল, "শক্তি দাও। আমাকে শক্তি দাও প্রভু। জীবিতের শরীর থেকে প্রাণ নির্গত করার শক্তি দাও। মৃতের শরীরে প্রাণ সঞ্চার করার শক্তি দাও প্রভু। তোমার শক্তির একটি নিদর্শন আমাকে প্রদর্শন কর। প্রদর্শন কর প্রভু।"

কোরায়শী তীব্র মনোযোগ দিয়ে ছাগলের কাটা মাথাটার দিকে তাকিয়ে রইল এবং হঠাৎ করে ঘরের মাঝে একটা কটু গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। আলোগুলো দপ দপ করে নিভে যায়। শুধু বড় বড় কয়েকটা মোমবাতি জ্বলতে থাকে, সেই মোমবাতির লালচে আলোতে দেখা যায় ছাগলের কাটা মাথাটি খুব ধীরে ধীরে তার মুখটি হা করে কালো জীবটি বের করে। জিবটা ধীরে ধীরে নড়ছে। ছাগলের চোখ দুটোতে প্রাণ সঞ্চার হয়– সেগুলো স্থির দৃষ্টিতে কোরায়শীর দিকে তাকিয়ে থাকে। সেই চোখের দৃষ্টি তীব্র এবং ভয়ঙ্কর।

কোরায়শী বিড় বিড় করে বলল, "আমাকে তোমার শক্তির অংশীদার করার জন্য কৃতজ্ঞ। প্রভু তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। মৃতের শরীরে প্রাণ সঞ্চার করার জন্যে কৃতজ্ঞ। তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি প্রভু আমি মৃতদের জগতে তোমার প্রভুত্ব ছড়িয়ে দেব। অন্ধকার জগতের প্রাণীদের ডেকে আনব। তোমার আনুগত্যের কাছে মাথা নিচু করব। আমাদের সকলের আত্মা তোমার কাছে সমর্পণ করব। তার বিনিময়ে তুমি শুধু শক্তি দাও! শক্তি দাও! শক্তি দাও!"

কোরায়শী মাথা নিচু করে মেঝেতে উন্মাদের মতো আঘাত করতে থাকে।

ঘর থেকে কোরায়শী যখন বের হয়ে আসে তখন তার চোখ টকটকে লাল। রেলিংয়ের কাছাকাছি লঞ্চের সারেং দাঁড়িয়েছিল, কোরায়শীকে দেখে একটু এগিয়ে এসে বলল, "স্যার, একটা জরুরী কথা ছিল স্যার।"

"কী কথা?"

"আবহাওয়া তো খুব খারাপ। দুই নম্বর বিপদ সংকেত দিয়েছে– সংকেত আরো বাড়বে। একটা সাইক্লোন আসছে।"

"জানি।"

"এইখানে থাকা নিরাপদ না। আমাদের সরে যেতে হবে।"

কোরায়শী মাথা নাড়ল, বলল, "না। সরে যাওয়া যাবে না।"

"সাইক্লোন যদি এদিকে আসে এই লঞ্চ উড়িয়ে নিয়ে যাবে স্যার।"

"নিলে নিবে।"

"আমি লঞ্চের সারেং। লঞ্চের ভালোমন্দ আমাকে দেখতে হয় স্যার। মালিক দায়িত্বটা আমাকে দিয়েছে।"

"আমি তোমার মালিককে টাকা দিয়ে লঞ্চ ভাড়া করেছি। এখন আমি মালিক। এখন আমি তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছি।"

"লঞ্চের আরো যারা আছে তারা কেউ এই ঝড়ের মাঝখানে থাকতে চাচ্ছে না।"

কোরায়শী কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে সারেংয়ের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর বলল, "তোমার সব লোকজনকে ডাকো।"

"ডাকব?"

"হ্যা।"

"এখন?"

"হ্যাঁ।"

কিছুক্ষণের মাঝেই সারেং সবাইকে ডেকে নিয়ে এলো। মানুষগুলো দুশ্চিন্তিত মুখে কোরায়শীর সামনে এসে দাঁড়ালো। গত কয়েকদিন থেকে তারা এই মানুষটিকে দেখছে, মানুষটাকে তারা কখনো বুঝে উঠতে পারে নি। এই ভোরবেলা এরকম কালো একটা আলখাল্লা পরা অবস্থায় মানুষটাকে একই সাথে বিচিত্র এবং ভয়ঙ্কর দেখায়।

কোরায়শী শীতল কণ্ঠে বলল, "সারেং বলছে তোমরা এখানে থাকতে চাইছ না। কথাটা কি সত্যি?"

মানুষগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। একজন মাথা নেড়ে বলল, "জী স্যার। আবহাওয়া খুব খারাপ। এখন যদি না যাই পরে যেতে পারব না।"

"না পারলে নাই। কিন্তু আমি এখন যেতে পারব না।" কোরায়শী কঠিন গলায় বলল, "আমি এইখানে একটা কাজ করতে এসেছি সেই কাজ শেষ না করে যাওয়া যাবে না।"

"কিন্তু স্যার–"

কোরায়শী কঠিন গলায় বলল, "আমি কোনো কথা শুনতে চাই না।"

মানুষটা আবার চেষ্ট করল, "কিন্তু স্যার–"

"চুপ করো তুমি।" কোরায়শী ধমকে উঠে বলল, "একটা কথাও না।"

মানুষটি দুর্বীনিত কণ্ঠে বলল, "এইটা যুক্তির কথা হলো না স্যার। গেলবার ঘূর্ণিঝড়ের সময়–"

"চুপ।" কোরায়শী হিংস্র গলায় বলল, "চুপ।"

হঠাৎ করে মানুষটির কথা বন্ধ হয়ে যায়। সবাই অবাক হয়ে দেখল মানুষটার চোখ মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু গলা দিয়ে একটা শব্দও বের হচ্ছে না। সে থর থর করে কাঁপতে থাকে। মুখ হা করে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করে। কোরায়শী তার হাত তুলে মানুষটার দিকে ইঙ্গিত করতেই সে ছিটকে উপরে উঠে পিছনের দেওয়ালে আঘাত করল। মানুষটা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কোরায়শীর দিকে তাকিয়ে থাকে, তার গলা দিয়ে হঠাৎ এক ঝলক রক্ত বের হয়ে এলো, বুকের কাপড় সেই রক্তে ভিজে লাল হয়ে যায়।

কোরায়শী এবারে অন্য সবার দিকে তাকাল, তারপর হিংস্র গলায় বলল, "আর কেউ?"

কেউ কোনো কথা বলল না। কোরায়শী শীতল গলায় বলল, "যদি আমার কথার অবাধ্য হও তোমাদের অবস্থা কী হতে পারে দেখিয়ে রাখলাম! বুঝেছ?"

সবাই মাথা নাড়ল। কোরায়শী বলল, "যাও, কাজে যাও।"

মানুষগুলো একজন একজন করে সরে যায়। রক্তে ভেজা মানুষটা শূন্য দৃষ্টিতে কোরায়শীর দিকে তাকিয়ে থাকে, কেউ তাকে নিয়ে যাবার সাহস পেলো না।

বাইরে তখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ ঝড়ো বাতাস বইছে। আকাশে ধূসর এক ধরনের রং, কেমন যেন থমথমে হয়ে আছে চারিদিকে। কালো রংয়ের একটা পাখি কর্কশ শব্দ করতে করতে লঞ্চটাকে ঘিরে উড়তে থাকে। কোরায়শী ফিস ফিস করে বলল, "আসছি! আমি আসছি!"

নৌকাটা ঢেউয়ের ধাক্কায় মাঝে মাঝেই বিপদজনকভাবে দুলে উঠছে। বশির মাঝি সাবধানে নৌকাটাকে স্থির রেখে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বৃষ্টিতে তার সারা শরীর ভিজে গেছে। মাথায় গামছাটা বেঁধে রেখেছে। একটু পর পর সেই গামছা দিয়ে তার মুখটা মুছে নিচ্ছে। এরকম আবহাওয়ায় তার নৌকা নিয়ে বের হওয়া ঠিক হয় নাই, কিন্তু মহিলাটার কথা শুনে সে না এসে পারে নি। তার টাকার দরকার সেটি সত্যি কিন্তু মহিলাটার গলার স্বরে কিছু একটা ছিলো, মনে হচ্ছিল আসলেই খুব একটা বিপদে পড়েছে। বিপদে পড়লে মানুষকে সাহায্য করতে হয়– বশির মাঝি সেটাই করার চেষ্টা করছে। নৌকাটা সামনে নেয়ার চেষ্টা করছে।

ছইয়ের ভেতরে মহিলাটা তার বাচ্চাটাকে নিয়ে বসে আছে। এরকম বিপদজনক একটা অবস্থায় তাদের যেটুকু ভয় পাওয়ার কথা তারা সেরকম ভয় পেয়েছে বলে মনে হয় না। মহিলাটা শুধু মাঝে মাঝে মাথা বের করে জানতে চেয়েছে আর কতোদূর বাকী।

বশির মাঝি বলেছে আরো ঘণ্টাখানেক যেতে হবে। নদীর যে অবস্থা তার মনে হচ্ছে হয়তো ঘণ্টাখানেক থেকে বেশি সময় নেবে। যদি নৌকাটার কিছু একটা হয়ে যায় তাহলে অন্য কথা। মহিলাটা কিংবা তার বাচ্চাটা সাঁতার জানে কী না কে জানে।

চৈতী জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলো, বৃষ্টির ছাট একটু বেড়েছে। আকাশে মেঘের রংটি দেখতে দেখতে পাল্টে গিয়েছে, এখন কেমন যেন কালচে রং, দেখে এক ধরনের আতংক হয়। কিছুক্ষণ আগে রাজু বের হয়ে গেছে, এখনো ফিরে আসে নি। কোথায় গিয়েছে জানে না। চৈতীর কাছে পুরো ব্যাপারটা একটু অবাস্তব মনে হয়– মাত্র কয়েকদিন আগেও সে ছিলো পৃথিবীর একেবারে উল্টো পৃষ্ঠায়। তার একজন অপদার্থ স্বামী ছিলো, বাড়ী ঘর ছিলো, আধুনিক একটা জীবন ছিলো। এখন সে দাঁড়িয়ে আছে মাটির একটা ঘরে। ছোট একটা জানালা দিয়ে সে বাইরে তাকিয়ে দেখছে বৃষ্টিতে ভেজা একটা গ্রাম! কী আশ্চর্য।

ঠিক এরকম সময় সে রাজুকে দেখতে পেলো, মাথায় একটা ছাতা ধরে সে কাদা মাটিতে পা ফেলে সাবধানে এগিয়ে আসছে। ঘরের দরজা খুলে সে ছাতাটা বন্ধ করে বাইরে রেখে ভেতরে এসে ঢুকলো। চৈতী বলল, "তুমি একেবারে ভিজে গেছ।"

"হ্যাঁ। বাংলাদেশের বৃষ্টিতে শুকনো থাকার কোনো বুদ্ধি নেই।"

"মাথাটা মুছে ফেলো পরে ঠান্ডা লেগে যাবে।"

রাজু বলল, "এগুলো হচ্ছে মিথ। কুসংস্কার। সত্যি না। মাথা না মুছলেও আসলে ঠাণ্ডা লাগে না। এই দেশে মানুষেরা ঘন্টার পর ঘণ্টা পানিতে ভিজে তাদের কিছু হয় না।"

"যার যেরকম অভ্যাস। মাছদের কখনো ঠান্ডা লাগে না। নিমোনিয়া হয় না। ছোট থাকতে স্কুলে বাগধারা পড়নি– ব্যাঙের সর্দি?"

রাজু একটু ইতস্তত করে বলল, "চৈতী।"

"কী হলো?"

"আমার খুব খারাপ লাগছে।"

"কী জন্যে?"

"তোমাকে এভাবে হৈ চৈ করে ডাকিয়ে আনলাম। অথচ দেখো কী বাজে আবহাওয়া। তুমি বেশির ভাগ সময়ে এই ছোট একটা মাটির ঘরে বসে আছ।"

"তুমি বাজে আবহাওয়া কেন বলছ? এটা মোটেও বাজে আবহাওয়া না। এটা একটা অন্যরকম আবহাওয়া।"

"ঠিক আছে তোমার যদি এই আবহাওয়াটা ভালো লাগে তাহলে ভালোই। উপভোগ কর।"

"করছি।"

রাজু বলল, "কিন্তু এখন অন্য একটা সমস্যা হচ্ছে।"

"কী সমস্যা?"

"খবর এসেছে সাইক্লোনটা ঠিক এদিকে এগিয়ে আসছে।"

"তাই নাকী?"

"হ্যাঁ। এই চরের সব মানুষকে উত্তরে সরে যেতে হবে। অর্ডার এসেছে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। মিলিটারীর লোকজন বড় ট্রলার নিয়ে এসেছে, লোকজনকে নিয়ে যাচ্ছে।"

"হাউ ইন্টারস্টিং! আমাদেরও যেতে হবে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু–" রাজু হঠাৎ করে থেমে গেলো।

"কিন্তু কী?"

"আমি এখনই যেতে পারব না। আমাকে এখানে আরো কিছু সময় থাকতে হবে।"

চৈতী একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

রাজু ইতস্তত করে বলল, "আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না।"

চৈতী হাসার ভঙ্গী করে বলল, "একটু চেষ্টা করে দেখ, হয়তো বুঝতে পারব। আমাকে দেখে তোমার যত বোকা মনে হচ্ছে আমি আসলে তত বোকা না!"

রাজু একটু হাসল, বলল, "আমি সেটা জানি। সেজন্যেই বলতে সাহস পাচ্ছি না।"

"বল।"

"ঠিক আছে বলছি।" হঠাৎ করে রাজুর মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়, সে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "একটা ছোট বাচ্চা খুব বিপদে পড়েছে। তার সাহায্যের দরকার। আমার কাছে আসছে সাহায্যের জন্যে।"

"কে ছোট বাচ্চাটা?"

"আমি জানি না।"

"কখন আসছে? কে নিয়ে আসছে?"

"সেটাও জানি না।"

চৈতী অবাক হয়ে বলল, "বাচ্চাটা যে আসছে তুমি সেটা কেমন করে জান? কে বলেছে তোমাকে?"

"কেউ বলে নি। কিন্তু আমি জানি।" রাজু একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "তুমি তো জান! আমি তোমাকে বলেছিলাম আমি অনেক কিছু দেখি শুনি বুঝি যেগুলো অন্যেরা দেখে না, শুনে না– বুঝেও না।"

"হ্যাঁ বলেছিলে।"

"এটা সেরকম। আমি যতবার চোখ বন্ধ করি ততবার দেখতে পাই সামনের এই মাটির রাস্তা দিয়ে একটা ছোট বাচ্চা ছুটতে ছুটতে আসছে। বৃষ্টিতে ভিজে আছে। মাটির রাস্তায় দৌড়াতে গিয়ে সে বারবার পড়ে যাচ্ছে। আবার কোনোমতে উঠে দৌড়াচ্ছে, মাটি কাদা লেগে আছে সারা শরীরে। বাচ্চাটার চোখে মুখে ভয়। আতংক। আর–"

"আর কী?"

"আর বাচ্চাটার পিছনে–" রাজু আবার থেমে গেল।

চৈতী জিজ্ঞেস করল, "বাচ্চার পিছনে কী?"

"দানব।"

"দানব?"

"হ্যাঁ। অসংখ্য দানব তাকে ধরে ফেলতে চাইছে। বাচ্চাটি চিৎকার করছে, রাজু! রাজু তুমি কোথায়!"

চৈতী কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে রাজুর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, "তোমার ধারণা আসলেই এটা ঘটবে?"

"হ্যাঁ। আমি জানি একটা বাচ্চা আমার কাছে আসছে। তাকে না নিয়ে আমি এখান থেকে যেতে পারব না।"

"ঠিক আছে রাজু। আমিও থাকব তোমার সাথে।"

"তুমিও থাকবে?"

"হ্যাঁ। তুমি যদি থাকতে পার, তাহলে আমি কেন পারব না?" তাছাড়া বাচ্চাটার যদি সাহায্য লাগে আমি সাহায্য করতে পারব। আমি ছোট বাচ্চা খুব পছন্দ করি।"

রাজু বলল, "কাজটা খুব বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু করার নেই। যদি চলে যেতে না পারি, রাতটা এখানে কাটাতে হবে। এখানে একটা সাইক্লোন শেল্টার তৈরি করা শুরু করেছিলো– এখনো শেষ হয় নি। আমরা সেখানে থাকতে পারি। বৃষ্টিতে ভিজে যাব কিন্তু টাইডাল ওয়েভ থেকে বেঁচে যাব।"

"চমৎকার একটা এডভেঞ্চার হবে।"

"একটা এডভেঞ্চার হবে জানি। কিন্তু সেটা চমৎকার হবে কী না বুঝতে পারছি না।"

"এডভেঞ্চার মাত্রই চমৎকার। এডভেঞ্চার কখনো পচা হয় না।"

রাজু চৈতীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আনমনা হয়ে যায়, সে নারী কণ্ঠের একটা

হাহাকার শুনতে পায়, কেউ একজন বলছে, "বাঁচাও। বাঁচাও– আমাদের বাঁচাও।"

কে বলছে? কাকে বাঁচাতে হবে? কার হাত থেকে বাঁচাবে?

বশির মাঝি নৌকাটা ধাক্কা দিয়ে ঘাটে লাগিয়ে দিয়ে বলল, "পৌঁছে গেছি আপা।"

নীরা বলল, "থ্যাংক ইউ। আপনি আমাদের না পৌঁছালে আমরা কোনোদিন পৌঁছাতে পারতাম না। আপনি খুব বড় একটা উপকার করেছেন।"

"এখন কেমন করে যাবেন? ছাতা আছে?"

"ছাতা লাগবে না। একটু আধটু ভিজলে কোনো ক্ষতি হয় না।"

নীরা তার ব্যাগ বের করে সেখান থেকে এক তাড়া নোট বের করে বশির মাঝির দিকে এগিয়ে দেয়, "নেন।"

বশির চোখ কপালে তুলে বলল, "কতো টাকা দিচ্ছেন।"

"জানি না। আমার এখন আর টাকার দরকার নেই। নেন রাখেন।"

বশির মাঝি হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো নেয়। কতো টাকা সেটা গোনার ইচ্ছে করছিলো কিন্তু সে গুনলো না, জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যেতে হবে জানেন?"

নীরা জানে না কিন্তু সেটা আর বলল না, মাথা নেড়ে বলল, "সেটা জেনে যাব।"

নীরা রাজুর হাত ধরে তীরে নেমে আসে। কাদায় তাদের পা মাখামাখি হয়ে গেছে কিন্তু এখন সেটা নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। ব্যাগটা ঘাড়ে ঝুলিয়ে একটা তোয়ালে মাথায় ধরে দুজন গ্রামের রাস্তায় ছুটতে থাকে। বৃষ্টির ছাটে কিছুক্ষণের মাঝেই দুজনে ভিজে চুপসে যায়।

বড় একটা ঝাঁকড়া গাছ পার হতেই হঠাৎ করে তাদের পথ আগলে দাঁড়ালো একজন মানুষ। নীরা চোখ তুলে তাকালো, একটা রেন কোট পরে কোরায়শী দাঁড়িয়ে আছে। কোরায়শী চাপা স্বরে হাসার চেষ্টা করে বলল, "ওয়েলকাম নীরা। লুসিফারের জগতে তোমাকে ওয়েলকাম!"

"পথ ছাড়ো কোরায়শী।"

"আমি তোমার লীডার। তুমি আমাকে সম্মান করে কথা বল নীরা।"

"তুমি আমার লীডার না। পথ ছাড়ো।"

"বাচ্চাটাকে আমার হাতে দাও। দিয়ে তুমি চলে যাও!"

"তোমায় নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে। তাই তুমি ভাবছ আমি তোমাকে আমার বাচ্চাটাকে দিয়ে দেব।"

"আগে তো দিয়েছিলে।"

"আগে আরো অনেক কিছু করেছি। আমি আর আগের মানুষ না। তুমি সেটা ভালো করে জান।"

কোরায়শী তখন এক পা এগিয়ে আসে, বলে, "দাও। বাচ্চাটাকে দাও।"

"সাহস থাকলে আমার কাছ থেকে নাও।"

কোরায়শী তখন এক পা এগিয়ে আসে। নীরা তার ঘাড়ে ঝোলানো ব্যাগটা হঠাৎ করে কোরায়শীর মুখে ছুড়ে মারলো। কোরায়শী এরকম একটা ব্যাপারের জন্যে প্রস্তুত ছিলো না। তাল সামলাতে গিয়ে পা পিছলে নিচে পড়ে গেলো। পড়ার সাথে সাথেই কোরায়শী আবার উঠে দাঁড়িয়েছে কিন্তু তার মাঝে নীরা বাপ্পীকে ধাক্কা দিয়ে সামনে পাঠিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলল, "দৌড়া বাপ্পী! দৌড়া–"

বাপ্পী তখন ছুটতে থাকে। তার মা বলেছিলো তাকে দৌড়াতে হবে। সে প্রাণপনে দৌড়ায়। কোরায়শী বাপ্পীর পিছনে যেতে চাইছিলো কিন্তু নীরা তখন দুই হাত তুলে কোরায়শীর পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। কোরায়শী হুংকার দিয়ে বলল, "পথ ছাড়ো।"

"ছাড়ব না।"

"নীরা! আমি তোমাকে শেষ করে দেব।"

"দাও!"

"সরে যাও।"

"সরব না।"

কোরায়শীর মুখটা হঠাৎ হিংস্র হয়ে ওঠে, তার দুই চোখ থেকে যেন আগুন বের হতে থাকে। সে দুই হাত তুলে নীরাকে ধরে ফেলার ভঙ্গী করে সাথে সাথে কোরায়শীর শরীরের পুরো অশুভ শক্তি হঠাৎ করে যেন বিস্ফোরণের মতো বের হয়ে এলো। নীরার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে, হঠাৎ সে ছিটকে উপরে উঠে যায় তারপর নিচে আছড়ে পরে। নীরা কোনোমতে হামাগুড়ি দিয়ে আবার উঠে বসে, আবার কোরায়শীর পথ আটকে দাঁড়ায়– সে কিছুতেই কোরায়শীকে বাপ্পীর পিছনে যেতে দিবে না।

কোরায়শী আবার এগিয়ে আসে, তার হাতটা সামনে এগিয়ে দিতেই নীরার মনে হলো অদৃশ্য কোনো হাত তার গলা চেপে ধরেছে; তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চায়। প্রাণপনে সে লোহার মতো অদৃশ্য হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে

চায়, পারে না। ঝলকে ঝলকে তার গলা দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসে, কিন্তু তারপরেও সে পথ ছাড়ে না। দুই হাত তুলে সে কোরায়শীর পথ আটকে রাখে, চাপা গলায় বলে, "তোমাকে আমি যেতে দেব না শয়তান!"

কোরায়শী হিংস্র মুখে এগিয়ে আসে, দুই হাত সামনে এগিয়ে দিতেই প্রচন্ড যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে থাকে, মুখ দিয়ে আবার কয়েক ঝলক রক্ত বের হয়ে আসে। তারপর সে টলতে টলতে নিচে পড়ে যায়। একবার মাথা তোলার চেষ্টা করল, পারল না। সে চোখ বন্ধ করে মনে মনে বলল, "খোদা তুমি আমার বাচ্চাটাকে রক্ষা করো। আমি তোমাকে কোনোদিন ডাকি নি। তোমার কাছে কিছু চাই নি। আজকে চাইলাম খোদা। আর কোনোদিন চাইব না।"

মাটির সাথে মাথা লাগিয়ে নীরা শুয়ে রইল। তার শরীর নিথর এবং প্রাণহীন। সন্তানকে বাঁচানোর তার আর কোনো উপায় ছিল না। নীরা সেটা জানতো। অনেকদিন থেকে জানতো।

চৈতী অবাক হয়ে দেখলো বৃষ্টির পানিতে ছুটতে ছুটতে একটা শিশু আসছে। বৃষ্টিতে সারা শরীর ভিজে গেছে, শরীরে কাদা মাটি। শিশুটা চিৎকার করছে, "রাজু! রাজু! তুমি কোথায়।" ঠিক যেভাবে রাজু বলেছিলো। "আমার মায়ের কী হবে?"

রাজু ছুটে গেলো, শিশুটিকে জাপটে ধরে সে বুকে তুলে নেয়। শিশুটি অবাক হয়ে রাজুর দিকে তাকালো, বলল, "তুমি রাজু?"

"হ্যাঁ, আমি রাজু।"

"আমাকে বাঁচাও।"

"আমি তোমাকে বাঁচাব–"

"আমার নাম বাপ্পী।"

"আমি জানি।"

"আমার মা–"

"তোমার মা তোমাকে রক্ষা করছেন বাপ্পী।"

বাপ্পী হঠাৎ করে তার চোখ বন্ধ করল। সে জানে তার মা নেই। মা তাকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেছে। সে তার শরীরে আর শক্তি খুঁজে পেলো না।

রাজু বাপ্পীকে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলো, চৈতী অবাক হয়ে বলল, "আমি এই বাচ্চাটাকে দেখেছি।"

"কোথায় দেখেছ?"

"প্লেনে। সাথে তার মা ছিল। মা কোথায়?"

রাজু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক জানি না। ধারণা করছি মারা গেছে।"

পুরো চরটি জনহীন। রাজু চৈতী আর বাপ্পী ছাড়া একটি মানুষও নেই। ঝির ঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিল, হঠাৎ করে বৃষ্টিটা থেমে গেছে। আকাশে মেঘগুলো জীবন্ত প্রাণীর মতো নড়ছে, মাঝে মাঝে দমকা বাতাস। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব, মনে হয় ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটবে।

রাজু বলল, "রাতে কী হয় জানি না। চল আমরা এখনই সাইক্লোন শেল্টারে যাই।"

"চল।"

"টাইডাল ওয়েভ শুরু হলে সব ভাসিয়ে নেবে।"

"দরকারী কয়েকটা জিনিষ নিয়ে নিই?"

"হ্যাঁ, নিচ্ছি।"

চৈতী একটা ব্যাগে কিছু জিনিষপত্র নিয়ে বাপ্পী. হাত ধরে যখন ঘর থেকে বের হলো তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। বাইরে রাজু অপেক্ষা করছিলো, বলল, "চল।"

"কতোদূর?"

"বেশি দূর নয়। রাস্তাটা খারাপ হাঁটতে কষ্ট হবে।"

"তাতে সমস্যা নেই।"

পুরো পথটাতে তারা কোনো কথা বলল না, কেউ মুখে উচ্চারণ করছিলো না কিন্তু সবাই বুঝতে পারছিলো কিছু একটা ঠিক নেই। কী ঠিক নেই তারা বুঝতে পারছিলো না। তাদের মনে হচ্ছিল সাথে আরো কেউ আছে। তারা প্রায় স্পষ্ট পিছনে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। চৈতী মাঝে মাঝেই ঘুরে ঘুরে পিছনে তাকিয়েছে কিন্তু কাউকে দেখতে পায় নি। হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়েছে সব্ সব্ শব্দ করে কিছু একটা পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, মাথা ঘুরে তাকিয়েছে, দেখেছে কিছু নেই। মাথার উপর দিয়ে ডানা ঝাপটিয়ে এক সাথে অনেকগুলো বাদুর কর্কশ শব্দ

করে উড়ে যায়। গাছের ডালে বসে থাকা অনেকগুলো পাখী হঠাৎ করে তীক্ষ্ণ শব্দ করে চিৎকার করে উড়ে যেতে থাকে। মনে হতে থাকে বহুদূর থেকে একটা প্রাণী চিৎকার করে কাঁদছে। চৈতী শক্ত করে বাপ্পীকে ধরে রাখলো- সে টের পায় তার হাতের মুঠোয় বাপ্পীর ছোট হাতটা থর থর করে কাঁপছে।

সাইক্লোন শেল্টারটা কেউ কোনোদিন ব্যবহার করে নি তাই সেটা নানারকম জঞ্জাল দিয়ে বোঝাই। বিপজ্জনক একটা সিঁড়ি দিয়ে তারা তিনজন উপরে উঠে যায়। শেল্টারের নানা জায়গায় নানারকম পশুপাখী আশ্রয় নিয়েছিলো হঠাৎ করে সেগুলো চিৎকার করতে করতে পালিয়ে গেলো।

রাজু জঞ্জাল পরিষ্কার করে তিনজনের বসার মতো একটা জায়গা করে নিলো। উপরে খোলা আকাশ, যখন বৃষ্টি শুরু হবে তখন তাদেরকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচানোর কিছু নেই। একটা রাত কষ্ট করে থাকতে হবে।

চৈতী একটা হ্যারিকেন জ্বালালো। হ্যারিকেনের আলোতে পুরো এলাকাটাকে কেমন যেন রহস্যময় মনে হয়। রাজু ফ্লাস্কে করে গরম দুধ নিয়ে এসেছিলো, একটা মগে ঢেলে সে বাপ্পীর দিকে এগিয়ে দিলো, বাপ্পী মাথা নেড়ে বলল, সে খাবে না। তার খেতে ইচ্ছে করছে না।

রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে ঝড় বেড়ে উঠার কথা ছিলো কিন্তু হলো ঠিক তার উল্টো। ধীরে ধীরে বাতাস কমে এলো মেঘ কেটে গেলো এবং চারপাশ আশ্চর্য রকম নীরব হয়ে গেলো। চৈতী অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে? চারপাশে এতো নীরব কেন?"

"মনে হয় একেবারে শেষ মুহূর্তে সাইক্লোনটা ঘুরে অন্যদিকে চলে গেছে।"

"তা হয়তো গিয়েছে। কিন্তু কোনো শব্দ নেই কেন? গাছের পাতাও কেন নড়ছে না?"

"বুঝতে পারছি না।"

"চৈতী বলল, মনে আছে গত রাতে কতো ঝিঁঝিঁ ডাকছিলো? কোথায় গিয়েছে ঝিঁঝিঁ?"

রাজু চুপ করে রইল, সে উত্তরটা জানে কিন্তু চৈতীকে বলতে চাইল না। রাজু অনুভব করতে পারে তাদের চারপাশে ভয়ঙ্কর অশুভ কিছু অশরীরি ঘুরছে। যখন এই অশুভ অশরীরিরা আসে পোকামাকড় নিশ্চুপ হয়ে যায় পশুপাখী পালিয়ে যায়। এই এলাকায় এখন কোনো পশুপাখী নেই, পোকামাকড় নিশ্চুপ। গাছের পাতাও যেন বুঝতে পারে তারাও যেন শব্দ করতে ভয় পায়।

চৈতী হঠাৎ একটা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়। কেউ একজন টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। মনে হয় নিঃশ্বাসটা নিতে কষ্ট হচ্ছে, নিঃশ্বাসটা বুক থেকে বের হতে কষ্ট হচ্ছে। চৈতী ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কে?"

"তুমি এদের চিনবে না চৈতী। শুধু তুমি ভয় পেয়ো না।"

"ভয় পাব না?"

"না। এরা হচ্ছে অশুভ শক্তি। এদের একমাত্র শক্তি হচ্ছে– ভয়। আতঙ্ক। তোমাকে ভয় দেখাতে চাইবে, কিন্তু তুমি ভয় পাবে না। তুমি ভয় পেলেই তারা আরো ভয় দেখাবে।"

চৈতী কাঁপা গলায় বলল, "আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তো?"

"চাইলে পারবে। খ্যাপা পশুও তো মানুষের ক্ষতি করে সে জন্য কী আমরা ভয় পেয়ে বসে থাকি? থাকি না। আমরা মুখোমুখি হই। আমাদের মুখোমুখি হতে হবে। ভয় পাবে না। আমি আছি।"

চৈতী বলল, "হ্যাঁ রাজু তুমি আছ। তুমি আছ বলে আমি শক্তি পাচ্ছি।

ঠিক তখন কিছু মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পায়। শেল্টারের কাছাকাছি খানিকটা জমাট বাধা অন্ধকার নড়তে থাকে চাপা গলায় মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। চৈতী ফিস ফিস করে বলল, "কারা? ওখানে কারা?"

"যারা বাপ্পীকে নিতে চায় তারা।"

"কেন এসেছে?"

"বাপ্পীকে নিতে এসেছে।"

"কেমন করে নিবে?"

"এখনো জানি না।"

হঠাৎ করে জমাট বাধা অন্ধকারের পাশে একটা ছোট আগুন জ্বলে উঠলো সেই আগুনের শিখায় তারা দেখলো কালো আলখাল্লা পরা একজন দীর্ঘদেহী মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকে মানুষটির চেহারা বোঝা যায় না কিন্তু তারপরও তাকে দেখে কেমন যেন এক ধরনের আতংক হয়।

মানুষটির সামনে আরো কয়েকজন, তাদের আকার আকৃতি ছোট। মানুষ না পশু সেটাও ভালো করে বোঝা যায় না। দীর্ঘদেহী মানুষটি তার দুই হাত উপরে তুলে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলতে থাকে, শুনে মনে হয় সে তীব্র ভাষায় কাউকে গালাগাল করছে। কণ্ঠস্বরটি রাজু চিনতে পারলো, প্রায় অর্ধযুগ আগে সে এই কণ্ঠস্বরটি শুনেছিলো এখনো ভুলে যায় নি। কণ্ঠস্বরটি কোরায়শীর। কোরায়শী

এসেছে। আবার সে মুখোমুখি হবে কোরায়শীর।

কোরায়শী হঠাৎ করে থেমে যায় তারপর আবার কথা বলতে থাকে। এবারে তার গলার স্বর পরিবর্তন হয়ে যায় তীব্র গালাগালের বদলে এবারে কাতর অনুনয় বিনুনয়। প্রথমে সৃষ্টিকর্তাকে গালাগাল করেছে। এখন লুসিফারের অনুগ্রহ ভিক্ষা করছে।

কিছুক্ষণের মাঝে তার গলার স্বর পাল্টে গেলো এবারে হঠাৎ করে মন্ত্রের মতো তালে তালে কিছু একটা বলতে থাকে– বহুদিন আগে সে এটা শুনেছিলো। কোরায়েশী ডাকছে, "আয় আয় আয়রে। আয় আয় আয়রে।" লুসিফারকে ডাকতে শুরু করেছে কোরায়শী। এখন কী আসবে লুসিফার?

রাজু হঠাৎ করে চৈতীর আতংকিত গলায় স্বর শুনতে পেলো, "রাজু!"

"কী হয়েছে?"

"বাপ্পী জানি কীরকম করছে।"

রাজু বাপ্পীর উপর ঝুকে পড়ল, বাপ্পী মাথা নিচু করে আছে, তার সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে। চৈতী শক্ত করে ধরে রেখে ডাকলো, "বাপ্পী! বাপ্পী! কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমার?"

বাপ্পী হঠাৎ করে মাথা তুলে তাকালো সাথে সাথে চৈতী আতঙ্কে চিৎকার করে পিছনে সরে গেলো। তার চোখ দুটো জ্বলছে, ভেতর থেকে নীল এক ধরনের আলো বের হচ্ছে।

কোরায়শী আর ছোট ছোট মানুষগুলো তখন তালে তালে নাচছে। নাচতে নাচতে চিৎকার করছে, "আয় আয় আয় রে। আয় আয় আয়রে! আয় আয় আয়রে!"

বাপ্পীর সারা শরীর কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে সে তার একটা হাত উপরে তুললো, সেই হাতের আঙ্গুল থেকে চড় চড় করে লম্বা নখ বরে হয়ে আসতে থাকে।

বাইরে থেকে কোরায়েশীর গলার স্বর ভেসে আসে, "লুসি লুসি লুসিফার। আয় আয়রে! লুসি লুসি লুসিফার। আয় আয় রে!"

বাপ্পী মুখ হা করে তার জিবটা বের করে খসখসে জান্তব গলায় বলল, "আসছি। আমি আসছি!"

রাজু খপ করে বাপ্পীর হাত ধরে ফেলে তীব্র গলায় বলল, "না। তুমি আসবে না।"

বাপ্পী এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "আসব। আমি আসব।!"

"না। তুমি আস নি। তুমি আসবে না। তুমি কখনো আসবে না।"

বাপ্পী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমায় ডেকেছে। আমি যাব।"

"না, তোমাকে ডাকে নাই। লুসিফারকে ডেকেছে। তুমি লুসিফার না। তুমি বাপ্পী! বাপ্পী।"

"আমি বাপ্পী না। আমি বাপ্পী না।"

রাজু আবার বাপ্পীকে জাপটে ধরলো, এক ঝটকায় রাজুকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাপ্পী সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে থাকে। সে টলতে টলতে হাঁটছে। হাতগুলো দুলছে, মাথা নাড়াচ্ছে। মুখ দিয়ে হিংস্র একটা প্রাণীর মতো শব্দ বের হচ্ছে। পুরো এলাকটাতে হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর দূষিত গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে।

রাজু এবং রাজুর পিছু পিছু চৈতী ছুটে এলো। বাপ্পী টলতে টলতে এগিয়ে যায় এবং বাপ্পীকে আসতে দেখে কোরায়শী আর তাকে ঘিরে থাকা ছোট ছোট মানুষগুলো থেমে গেলো।

বাপ্পী ফিস ফিস করে বলল, "এসেছি। আমি এসেছি।"

হঠাৎ মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলল, "প্রভু লুসিফার, তোমাকে অভিবাদন। আমাকে গ্রহণ করো প্রভু। গ্রহণ কর আমাকে।"

রাজু পিছন থেকে এসে বাপ্পীকে জাপটে ধরে বলল, "না। তুমি লুসিফার না। তুমি বাপ্পী।"

কোরায়েশী মাথা উঁচু করে তাকালো, হা হা করে হাসতে হাসতে বলল, "প্রভু লুসিফার এসে গেছেন রাজু। তুমি তাকে আর ফেরাতে পারবে না।"

"আসে নাই। আমি তাকে আসতে দিব না।

"তুমি তাকে ফিরাতে পারবে না।"

"আমি তাকে আগে ফিরিয়েছি। আবার ফিরাব।"

সে খপ করে বাপ্পীকে ধরে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার দিকে তাকাও। বাপ্পী আমার চোখের দিকে তাকাও। তাকাও।"

বাপ্পী মুখ ঘুরিয়ে নেয়, বলে, "না তাকাব না।"

"তাকাতেই হবে। তাকাও।"

বাপ্পী মাথা ঘুরিয়ে তাকালো। রাজু তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাপ্পী তোমার মা সেই বহুদূর থেকে তোমাকে এনে আমার হাতে দিয়েছে। কেন দিয়েছে বাপ্পী? তোমার ভেতরে শয়তান এসে ভর করবে সে জন্যে দেয় নি। দিয়েছে তোমাকে রক্ষা করার জন্যে। বাপ্পী, তোমার উপরে শয়তানকে ভর করতে দিও না। দিও না বাপ্পী।

"কিন্তু আমি তো পারছি না।" বাপ্পী কাঁদতে থাকে, "পারছি না। পারছি না।"

"পারবে বাপ্পী তুমি পারবে। আমি তোমাকে শক্ত করে ধরেছি। আমার ভেতরে যেটুকু শক্তি আছে আমি তোমাকে দিচ্ছি। এই দেখো তোমার ভেতরে কতো শক্তি। তুমি এখন ইচ্ছা করলে পারবে। কোনো শয়তান তোমার উপর আসতে পারবে না। তুমি চেষ্টা কর বাপ্পী।"

বাপ্পী থর থর করে কাঁপতে থাকে, "আমাকে চেষ্টা করতে দিচ্ছে না।"

"তোমাকে চেষ্টা করতে হবে বাপ্পী। তোমাকে যেভাবে হোক চেষ্টা করতে হবে। তাকিয়ে দেখো– আমি একা নই। আমার সাথে সবাই আছে। পৃথিবীর যতো ভালো মানুষ তারা সবাই আছে। তাকিয়ে দেখো– তোমার মা আছে।"

"আম্মু?" আম্মু আছে?"

"হ্যাঁ। তোমার আম্মু আছে। তোমার আম্মু তোমাকে বাঁচানোর জন্যে এসেছে। দেখো।"

বাপ্পী চোখ খুলে তাকালো, তার মুখে হঠাৎ একটা হাসি ফুটে ওঠে, "আম্মু এসেছে? আম্মু তুমি এসেছ?"

বাপ্পী শুনলো তার আম্মু ফিস ফিস করে বলছে, "হ্যাঁ বাবা আমি এসেছি। তোর কোনো ভয় নেই।"

"কোনো ভয় নেই?"

"না।"

রাজু বাপ্পীকে শক্ত করে ধরে বলল, "বাপ্পী তুমি বল, দূর হও লুসিফার।"

বাপ্পী বলল, "দূর হও লুসিফার।"

বল, "ধ্বংস হও তুমি।"

বাপ্পী বলল, "ধ্বংস হও।"

ভয়ঙ্কর আর্তনাদের মতো একটা শব্দ হলো। মনে হলো আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে কিছু একটা আর্তচিৎকার করে ছুটে গেলো। ভয়ঙ্কর দূষিত গন্ধটি হঠাৎ যেন উঠে গেলো চারপাশ থেকে। থমথমে আতঙ্কের ভাবটি কেটে হালকা একটা আনন্দ যেন ভর করে সবাইকে।

বাপ্পী দুলে উঠে পড়ে যাচ্ছিল, চৈতী তাকে বুকে চেপে ধরল। ফিস ফিস করে বলল, "সোনা আমার। তোমার কোনো ভয় নেই। আমি তোমাকে বুকে ধরে রাখব। পেটে ধরি নি তো কী হয়েছে? পেটে না ধরেও মা হওয়া যায়। আমি জানি।"

বাপ্পীকে কোলে নিয়ে রাজু আর চৈতী যখন চলে যাচ্ছিল তখন কোরায়শীকে

দেখিয়ে চৈতী রাজুকে জিজ্ঞেস করল– "এই মানুষটা আমাদের কিছু করবে না তো?"

"না।"

"কেন না?"

"মানুষটা খুব বিপদে আছে। ভয়ঙ্কর বিপদ।"

"কী বিপদ?"

"সে লুসিফারকে ডেকে এনেছে, লুসিফার এসে কী দেখেছে?"

"কী দেখেছে?"

"তাকে কেউ চায় না। তার ভর করার জায়গা নেই। ছয় বছরের শিশুও তাকে বলে, দূর হয়ে যাও। ধ্বংস হও। তাই সে খুব রেগেছে। রেগে কী করবে জান?"

"কী করবে?"

"যে তাকে ডেকে এনে অপমান করেছে তাকে সে নিশ্চয়ই শাস্তি দেবে।"

"কী রকম শাস্তি?

"জানি না। খুব কঠিন শাস্তি।"

রাজুর কথা শেষ হবার আগেই তারা ভয়ঙ্কর একটা আর্তনাদের শব্দ শুনতে পেলো। শুনতে পেলো কাতর কণ্ঠে কোরায়েশী ক্ষমা চাইছে কিন্তু যার কাছে ক্ষমা চাইছে তার ভেতরে কোনো মায়া নেই, কোনো করুণা নেই, ভালোবাসা নেই।

হিংস্র পৈশাচিকতায় সেই প্রাণীটি কোরায়েশীকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে।

রাজু আর চৈতী দ্রুত সরে যেতে থাকে। এই আর্তনাদ তারা শুনতে চায় না।

ঝিক ঝিক শব্দ করে লঞ্চটা পানি কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। চৈতী বাপ্পীকে ধরে রেখে একটা চেয়ারে বসে আছে। বাপ্পী চৈতীর কোলে মাথা রেখে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। রাজু পাশেই রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। চৈতী তাকে ডাকলো, "রাজু।"

"বল।"

"সারা জীবন আমি একটা ছোট বাচ্চার মা হতে চেয়েছিলাম। পারি নি।

এখন মনে হচ্ছে খোদা আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলেন যে বাপ্পীকে আমার কাছে দেবেন, সে জন্যে আগে মা হতে দেন নি।"

রাজু মাথা নাড়ল, বলল, "ইচ্ছে করলে ব্যাপারটা এভাবে দেখা যায়।'

"এভাবেই দেখ।"

রাজু বলল, "এবার তাহলে আমি আমার কথাটা বলতে পারি?"

"বল।"

"খোদা মনে হয় ঠিক করে রেখেছিলেন তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবেন, সেজন্যে আমাকে বিয়ে করতে দেন নি।"

চৈতী রাজুর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইচ্ছে করলে ব্যাপারটা মনে হয় এভাবেও দেখা যায়।"

"দেখব?"

"দেখ।" চৈতী মুখ টিপে একটু হেসে বলল, রাজু– সে জন্যে আমি তোমাকে তুই করে বলতে দিই নি। ছেলে পেলেরা দেখবে বাবা-মা একজন আরেকজনকে তুই করে বলছে সেটা কেমন করে হয়?"

রাজু মাথা নাড়ল, বলল, "না। হয় না।"